সুগত চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি

অন্তরঙ্গতার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জীবন ও সংস্কৃতির উপর এই বইটি লেখা হয়েছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ইতিকথা, বর্নাঢ্য সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও ভাষার নমুনা (নির্বাচিত শব্দাবলী) প্রকাশ করা হয়েছে। এ জাতীয় বিষয় বস্তুর উপর বাংলাদেশে এই বইটি নিঃসন্দেহে একটি দুর্লভ সংযোজন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি

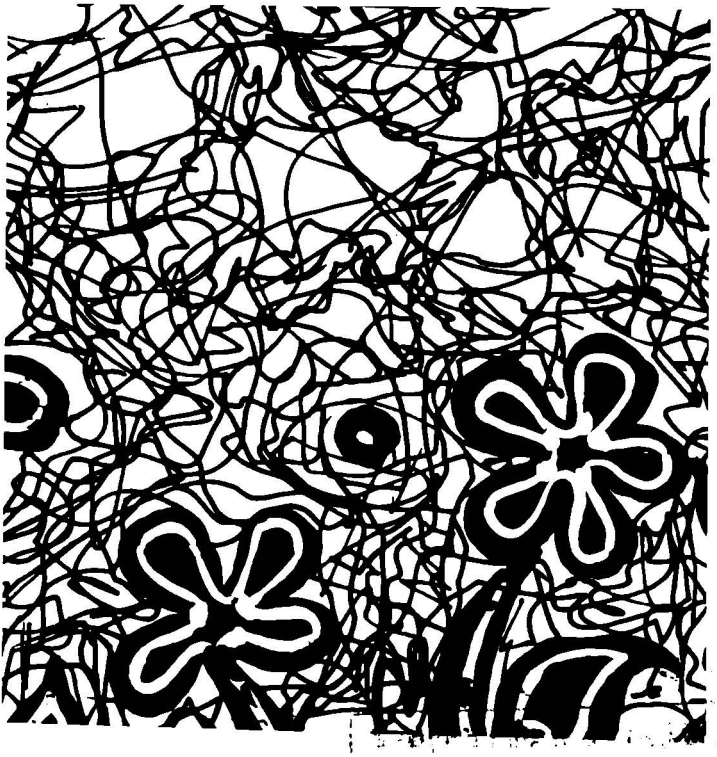

সুগত চাকমা

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং ঢাকা।

প্রকাশিকা ঃ ধীরা খীসা চাকমা, ট্রাইব্যাল অফিসার্স কলোনী, রাঙ্গামটি, বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ ঃ তনু মুরং

মুদ্রক ঃ সূদীপ্ত প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস, ৮/৮ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা।

মূল্য ঃ একশত টাকা

PARBATTYA CHATTAGRAMER UPAJATI O SANSKRITI by Sugata Chakma.

Published by Dhira Khisa Chakma, Tribal Officers' Colony, Rangamati, Bangladesh. 1st Edition: April, 1993 Dhaka.

PARBATTYA CHATTAGRAMER UPAJATI O SANSKRITI (Tribals and Culture of the Chittagong Hill Tracts) by Sugata Chakma, Price : Taka 100.00 only.

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় বিপুলেশ্বর দেওয়ান
–এর করকমলে

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশে বহু উপজাতি বসবাস করে। এদের অনেকগুলি দেশের দক্ষিণ–পূর্ব সীমান্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস করে। এ সকল উপজাতির অনেকের নিজস্ব বাচন (Dialect), সংস্কৃতি ও ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু দুর্গম পার্বত্য এলাকার বনাঞ্চলে বাস করার ফলে প্রচার ও প্রকাশনার অভাবে তাদের সংস্কৃতি ও জীবন ধারা এদেশের অনেকের কাছেই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। অথচ একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সংস্কৃতি বাংলাদেশেরই বৃহত্তর সংস্কৃতির একটি অংশ। ইহার সঠিক চর্চা দেশের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক অংগনকে আরও বর্ণাঢ্য ও সমৃদ্ধতর করতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই বিষয়ে অনেকের জানার কৌতূহল ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বই পুস্তুকের অভাবে তা জানা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায়, আমার কথা এই যে, আমার স্নেহভাজন ছাত্র সুগত চাকমা "পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি" নামে এই বইটি লিখেছে।

আশা করি, তার এই আন্তরিক প্রয়াস বৃথা যাবেনা এবং বইটি সুধী মহলে সমাদৃত হবে। আমি আন্তরিক ভাবেই তার বইটির সাফল্য ও বহুল প্রচার কামনা করি।

(অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা
এবং
সাবেক উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকাঃ ২৪ শে এপ্রিল
১৯৯৩ ইং

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, খ্যাং, চাক, খুমি, পাংখো, বোম, লুসেই-এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা উপজাতির বসবাস রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও কৃষ্টি রয়েছে যা দেশের অনেকের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

আমার জন্ম রাঙ্গামটির পাহাড়ে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই শৈশব থেকে তাদের সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য আমাকে তাদের জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ করেছে। বড় হওয়ার পর সে বিষয়ে আমার কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা ক্রমশই উত্তরোত্তর বেড়েছে। তাই তাদের সম্পর্কে যখনই যা পেয়েছি বা দেখেছি তা পড়েছি ও জানার চেষ্টা করেছি।

১৯৭৮ সালে কর্মজীবনে আমি যখন রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে সহকারী পরিচালক পদে যোগ দান করি, তখন উপজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যাপারে বিভিন্ন উপজাতি ও তাদের শিল্পীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ও সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার হয় এবং আমি সেই সুবর্ণ সুযোগ পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাই। ফলে তাদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার ও সেই বিষয়ে বহু মূল্যবান অপ্রকাশিত তথ্য পাওয়ার সুযোগ আমার হয়। এ ছাড়াও শৈশব থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু স্থান ভ্রমণের সময় বহুবার বহু উপজাতীয় গ্রাম স্বচক্ষে দেখার ও তাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণের সুযোগও আমার হয়েছে। ফলে ক্রমশই তাদের প্রতি জানার ব্যাপারে আমার আগ্রহ বেড়েছে। শৈশব ও কৈশোরে বিভিন্ন স্কুল জীবনে পড়ার সময় আমার অনেক সাথীই ছিল বিভিন্ন উপজাতির ছেলেমেয়ে। তাদের ভালবাসা, বেদনা ও শুভেচ্ছা আমাকে সব সময় তাদের সম্পর্কে লেখার ব্যাপারে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমার লেখাগুলিতে সব সময় তাদের প্রতি শুভেচ্ছা এবং তাদের জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও গভীর ভালবাসা রয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও তাদের কোন কোন বিষয় প্রকাশের ব্যাপারে আমার অজ্ঞাতে কোন ত্রুটি থেকে গেলে সে বিষয়ে আমি সকলের কাছে শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর যাদের কাছ থেকে এ বইটি লেখার ব্যাপারে কোন প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবুও সত্ত্বেও যে কয়জন শুভাকাঙ্ক্ষীর নাম এ বিষয়ে প্রকাশ না করলেই নয় তারা হলেন-রাঙ্গামাটিস্থ মোনঘর শিশুসদনের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা মাসুদা এম. রশীদ চৌধুরী (সায়মা) এবং ঢাকাস্থ সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস্-এর বাবুভাইসহসকল বন্ধু ও কর্মীরা।

আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যা নিয়ে B. Sc. (Hons) পড়ার সময় আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, তৎকালীন সেখানকার পদার্থ বিদ্যা বিভাগের প্রধান, পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং বর্তমানে 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' -এর চেয়ারম্যান, দেশের অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক সাহেব আমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহবশতঃ এই বইটির জন্য একটি শুভেচ্ছা দিয়েছেন। এটি আমার জীবনে আজীবন তাঁর আশীষ হয়ে থাকবে। তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রইল।

সবশেষে যাদের কথা না লিখলেই নয়, তাঁরা হলেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকারের নির্বাহী প্রকৌশলী মিঃ বুদ্ধেন্দু বিকাশ চাকমা ও তৎসহধর্মিনী ধীরা খীসা চাকমা আমাকে এই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে একান্ত আন্তরিকতার সাথে যে অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ও সহযোগীতা দান করেছেন তজ্জন্য তাঁদেরকে কেবল ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাইনা। তাদের ঐকান্তিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান আমার আগামী জীবনে পাথেয় হয়ে রইল। আমি তাদের পরিবারের সকলের জন্য সুখ ও মঙ্গল কামনা করে তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ ছাড়া আরও যারা সাহায্য করেছে তারা হলো আমার স্নেহাস্পদ প্রিয়, বাবু, বাবলী ও তনু এবং আরো অনেকে। তাদের সবার জন্য শুভাশীষ রইল। আর সবার শেষে বিশেষ ভাবে নাম উল্লেখ করতে হয় আমার সহধর্মিনী শীলা চাকমার। তার উৎসাহ দান আমাকে এই বইটি লেখার ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ যুগিয়েছে। এই জন্য তাকেও অজস্র ধন্যবাদ।

ঢাকাঃ ২১শে এপ্রিল ১৯৯৩ **সুগত চাকমা**

সূচীপত্র

ক্রমিক	উপজাতি	পৃষ্ঠা
১.	চাকমা	১৩
২.	মারমা	৩৭
৩.	ত্রিপুরা	৪৩
৪.	ম্রো	৫৫
৫.	চাক	৬৫
৬.	খ্যাং	৭৫
৭.	খুমি	৭৯
৮.	লুসেই, পাংখো এবং বোম	৮৩
৯.	পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিয় ভাষাগুলির শব্দ সংগ্রহ	৯৩

চাকমা

চাকমা তরুনী

চাকমা

পরিচিতি ও অবস্থানঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে গিরি নির্ঝরণী, হ্রদ এবং অরণ্যের অপরূপ নৈসর্গিক শোভা নিয়ে যে অঞ্চল অবস্থিত তার নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। বিশ্বের মানচিত্রে এ অঞ্চলের অবস্থান হলো উত্তর অক্ষাংশের ২১°২৫´ থেকে ২৩°৪৫´ ডিগ্রীতে এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯১°৪৫´ থেকে ৯২°৫২ ডিগ্রীতে। ১৮৬০ সালে বৃটিশ আমলে সর্বপ্রথম ৬৭৯৬ বর্গমাইলের মত এলাকা নিয়ে Chittagong hill tracts district বা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা নাম নিয়ে এই অঞ্চলটি একটি নতুন মর্যাদা অর্জন করেছিল। পরবর্তী কালে ১৯০১ সালে এর আয়তন কমে ৫১৩৮ বর্গমাইলে এসে দাঁড়ায় এবং পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১ খৃঃ) এর আয়তন আরও কমে ৫০৯৩ বর্গমাইল হয়। বর্তমানে সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা বিভক্ত হয়ে তিনটি জেলা হয়েছে। এগুলি হলো- ১ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, ২. বান্দরবান পার্বত্য জেলা (৪ঠা এপ্রিল ১৯৮১ ইং) এবং ৩. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা (১০ই অক্টোবর ১৯৮৩ ইং)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরে এবং উত্তরপূর্বে রয়েছে যথাক্রমে ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম (সাবেক লুসাই হিল)। এর দক্ষিণ পূর্বে মায়ানমার বা বার্মার আরাকান (রাখাইন স্টেট)। পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চিমে ও দক্ষিণে যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অবস্থিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বোম, উসাই, পাংখো, খুমি, লুসেই, খ্যাং ও চাক যে সকল মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি বা জাতিসত্ত্বা রয়েছে তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে প্রধান জাতিসত্ত্বা হলো চাকমা (Chakma)।

চাকমারা প্রধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত কক্সবাজার জেলায়ও বাস করে। এ ছাড়া চাকমারা ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিল ও অরুনাচল (সাবেক নেফা) রাজ্যেও বাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তঞ্চঙ্গ্যাদের নামআলাদা হলেও মূলতঃ তারা চাকমাদেরই একটি শাখা। আরাকানেও দৈংনাক নামে চাকমাদের একটি শাখা রয়েছে।

দল–উপদল ও লোকসংখ্যাঃ

চাকমারা প্রধানতঃ তিনটি দলে বিভক্ত –১. চাকমা (চাঙমা), ২. তঞ্চঙ্গ্যা (টংটংগ্যা) এবং ৩. দৈংনাক (দৈংতাক)। বর্মী ও আরাকানীরা চাকমাদেরকে সাক্ (Sak) বা থাক্ (Thak) বলে এবং তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে দৈংনাক বা দৈংতাক বলে। আপাতদৃষ্টিতে দৈং-থাক্ শব্দ থেকে দৈংতাক শব্দটি এসেছে বলে মনে হয়। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা পরিবারগুলির সংখ্যা ৩৯০০৫টি এবং তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারগুলির সংখ্যা ৩,২০৭ টি ছিল, উক্ত আদমশুমারীতে প্রতি পরিবারে গড়ে ৫.৭৫ জন লোক ধরা হয়েছে। এ থেকে ঐ সময় এখানে চাকমাদের লোক সংখ্যা আনুমানিক ২,২৪,২৭৯ জন এবং তঞ্চঙ্গাদের লোকসংখ্যা আনুমানিক ১৮৪৪০ জন ছিল বলে জানা যায়। ঐ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে লোক সংখ্যা ৭,৪৭,০২৬ জন ছিল। এদের মধ্যে উপজাতীয়দের লোকসংখ্যা আনুমানিক ৪,৬০,২৭০ জন। সুতরাং চাকমা ও তাদের অন্যতম শাখা তঞ্চঙ্গ্যাদের লোকসংখ্যা একত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় লোকদের মধ্যে শতকরা ৫০-এর কিঞ্চিৎ অধিক ছিল। উক্ত গণনায় কক্সবাজারের চাকমাদেরকে ধরা হয় নাই এখানে কক্সবাজার জেলায় টেকনাফ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে তাদের ১১টি গ্রাম রয়েছে। স্থানীয় রাখাইনরা তাদেরকে দৈংনাক বললেও তারা বর্তমানে তাদের নামের শেষে উপাধি হিসাবে চাকমা (Chakma) শব্দটি ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য যে, চাকমারা নিজেদেরকে চাঙমা (Changma) বলে। লুসেই, বোম, পাংখো এ সকল কুকি–চিনভাষী উপজাতীয়রা চাকমাদেরকে তাকাম (Takam) বলে। চট্টগ্রামবাসীরা চাকমাদেরকে চাম্মুয়া বলে। ১৯৭১ সালে ত্রিপুরায় চাকমাদের জনসংখ্যা ২৮,৬২২ জন ছিল এবং ১৯৬১ সালে মিজোরামে স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানের (উনিশ হাজারের উর্ধে) অধিকারী ছিল।

চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা উভয় সমাজে বেশ কয়েকটি (৩০ এর অধিক) উপদল রয়েছে। চাকমা সমাজে এগুলিকে গঝা এবং তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে এগুলিকে গসা বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেক গঝাতে রয়েছে কতগুলি 'গুথি' অর্থাৎ গোষ্ঠী। মূলতঃ কয়েকটি গোষ্ঠী মিলে এক একটি গঝা (লোক-দল) গঠিত হয়েছে।

চাকমা সমাজে গুথি বা গোষ্ঠীর সংখ্যা শতাধিক রয়েছে। এগুলির গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

ইতিকথা ও ইতিহাসঃ

চাকমাদের অতীত ইতিহাস এখনও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। এ যাবতকাল পর্যন্ত তাদের ইতিহাস সম্পর্কে যে সকল নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে সে সম্পর্কে নিম্নে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হলো। প্রথমে তাদের আদিবাসস্থান এবং উৎপত্তি সম্পর্কে যে কিংবদন্তীটি চাকমা সমাজে প্রচলিত রয়েছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ-

চাকমাদের বিশ্বাস সুদূর অতীতে তারা চম্পকনগর নামে একটি রাজ্যে বাস করতো। সেখান থেকে তারা বিজয়গিরি নামক একজন যুবরাজের নেতৃত্বে দক্ষিণ দিকে অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকানের কিছু অংশ জয় করে। এরপর তারা যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছিল তখন জানতে পারে যে, ইতিমধ্যে চম্পকনগরের বৃদ্ধরাজার মৃত্যু হয়েছে এবং বিজয়গিরির কনিষ্ঠভ্রাতা সমরগিরি তার অবর্তমানে চম্পকনগরের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। এ সংবাদ শুনে বিজয়গিরি খুবই মর্মাহত হন এবং তিনি চম্পকনগরে আর না ফিরে নতুন বিজিত রাজ্যে যান ও সেখানে সাপ্রেইকূলে রাজত্ব করতে থাকেন। তাঁর অনুগত সৈন্যরা তাঁর সাথে থেকে যায়। কালে তাদের সাথে চম্পকনগরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং চম্পকনগর ও তার বাসিন্দারা অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এখন চাকমাদের বিশ্বাস, তারা বিজয়গিরির সেই আরাকান বিজয়ী সৈন্যদেরই বংশধর। এ গেল কিংবদন্তী বা জনশ্রুতির কথা।

এবার চাকমাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কিছু কথা বলা যাক। এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রাচীন তথ্যটি পাওয়া যায় তীব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথের লেখা থেকে। ১৬০৮ সালে তিনি ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের উপর একটি বই লেখেন। এতে

তিনি লেখেন যে, মুসলিমদের কর্তৃকমগধ (বিহার) বিজয়ের সময় বহু বৌদ্ধভিক্ষু ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে কুকিভূমিতে চাগমা (Chagma) নামক একটি রাজ্যে চলে গিয়েছিল। রাজা বালাচন্দ্রের (Balasundra)-এর দ্বিতীয়পুত্র অতীতবাহন ঐ সময় চাগমার রাজা ছিলেন। Dr. Heinz Bechert সাম্প্রতিক কালে Contemporary Buddhism in Bengal and Tripura' (Educational misscellany, vol iv, No. 3 x 4, 1967) নামক একটি লেখাতে লামা তারানাথ বর্ণিত চাগমা (Chagma) এবং চাকমা (Chakma) শব্দ দু'টি সমার্থক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। Dr. Suniti Bhushan Quanungo মহোদয়কেও 'A history of chittagong' (Vol-1, Part-1 Chittagong 1988) বইটিতে উক্ত মতকে সমর্থন করতে দেখা যায়। তিনি অতীতবাহনের পিতা বালাচন্দ্র, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে রাজত্ব করেন বলে মত পোষণ করেন। Mr. Ishwarprasad তাঁর লিখিত 'A short history of the Muslim rule in India (Allahabad 1970, pp 53-54) বইটিতে মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বিহার জয়ের ঘটনাটিকে সম্ভবতঃ ১১৯৭ খৃঃ (About 1197 A.D) বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর ফলে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে কুকিভূমিতে চাগমা নামক একটি রাজ্য ছিল বলে জানা যাচ্ছে। চাকমারা নিজেদেরকে চাঙমা (Changma) বলে। এটি উচ্চারণের দিক থেকে চাগমা শব্দের কাছাকাছি। এ থেকে এবং অন্যান্য সূত্রের আলোকে চাকমারা দ্বাদশ শতাব্দীতে এতদঞ্চলে ছিলে বলে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। আরাকানী ইতিহাসকারেরাও ঐ সময় 'সাক' অর্থাৎ চাকমারা আরাকানের উত্তর দিকে এতদঞ্চলে বসবাস করছিল বলে লিখে আসছেন। মনিপুরীরাও অতীতে এদিকে তকলেঙ, নামক একটি রাজ্য ছিল বলে উল্লেখ করে থাকেন। (পূর্ণচন্দ্রচৌধুরীঃ ১৯২০ ইং)। লুসেই ও অন্যান্য কুকি-চিন ভাষীরা চাকমাদেরকে তাকাম বলে। এই 'তাকাম' শব্দটি ও মনিপুরীদের কথিত 'তকলেঙ' শব্দ দু'টিও সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ছাড়া চাকমা ও মনিপুরের বিষ্ণুপুরীয়াদের ভাষাগুলির মধ্যে মিল রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিষ্ণুপুরীয়ারা সিলেট জেলাতেও বাস করে। ফলে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চাকমারা ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন না কোন অঞ্চলে বসবাস করছিল বলে জানা যাচ্ছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ ইতিহাসবিদ Joa de Barros এতদঞ্চলের উপর একটি মানচিত্র আঁকেন ১৫৪০ সালে। J. J. A. Campos 1919) তাঁর ঐ মানচিত্রের শিরোনাম Descripcao do Reino de Bengalla ছিল। ডঃ আবদুল করিম সাহেব ঐ মানচিত্রের অঙ্কনকাল ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে (about 1550 A. D.) মনে করেন (Journal of the Asiati Society of Pakistan, Vol-Viii, No. ২, ১৯৬৩) দ্রঃ)। উক্ত মানচিত্রে De Barros কর্ণফুলী নদীর তীরে ২৩° থেকে ২৫° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে একটি স্থানের নাম Chacomas (চাকোমাস) লেখেছেন ((Da Asia de Joa de Barros, Lishon, Na Regia officina Typografica Anno MDCCLXX VII, 1973 দ্রঃ)। এই মূল্যবান তথ্যটিসহ এ বিষয়ে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য স্বর্গীয় অশোক কুমারদেওয়ান আবিষ্কার করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চাকমাদের প্রধান বাসস্থান সম্ভবতঃ এ চাকোমাসে ছিল। আরাকানী ঐতিহাসিক চান্দামালা লংকারা এই সময়কার একটি ঘটনার কথা লিখতে গিয়ে তাঁর লিখিত 'রাখাইন রাজাওয়াং সাইক্যম' (মান্দালয় ১৯৩১ ইং) বইটিতে লেখেন যে, ১৫৪৬ সালে পূর্বদিক থেকে বর্মীরাজা তবেং শোয়েহ্ থি যখন আরাকানের রাজধানী ম্রাউকউ অবরোধ করেন তখন উত্তর দিক থেকে উপাখান নামক একজন সাকরাজা (চাকমারাজা) আরাকানের উত্তরাংশে অভিযান চালিয়ে প্যাঁওয়া (কক্সবাজার জেলার রামু) শহর স্বল্পকালের জন্য দখল করেন। Sir Arthur P. Phayre সাহেব ও তাঁর লিখিত History of Burma (1883 P. 7a) বইটিতে উক্ত ঘটনার কথা নিম্নলিখিত লাইনগুলিতে লেখেন, "While Meng Beng (King of Arakan) was thus engaged, an enemy had appeared from the north called in Arakanese history the Thek or Sak King by which term the Raja of Tippera appears to be meant He had penetrated to Ramu." উল্লেখ্য যে, কক্সবাজার জেলার বামুর ২ মাইল পশ্চিমে চাকমারকূল নামক একটি স্থানের নাম এখনও আছে।

১৫৬১ সালে Gastadi নামক অপর একজন ইউরোপীয় BENGALA নামক একটি মানচিত্রে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরস্থ ভূখন্ডের নাম Chadma (চাডমা) লেখেছেন। ত্রিপুরার ইতিহাস লেখক কালী প্রসন্ন সেনও 'শ্রী রাজমালা' (২য় লহর) বইটিতে একটি মানচিত্রে উক্ত স্থানের নাম চাখমা ছিল বলে চিহ্নিত করেছেন। এ

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, চাকমারা এক সময় ঐখানে ছিল। হারবাং এর স্থানীয় রাখাইনদের মধ্যে একটি জনশ্রুতি আছে যে, বর্তমান সাতকানিয়া নামটি তাদের 'সাক-কান্যা (চাকমা-রাজকন্যা) শব্দগুলি থেকে এসেছে। প্রকৃত পক্ষে Rannell সাহেবের (১৮৮৩ সালের) সার্ভে রিপোর্টেও উক্ত স্থানের নাম Saccanya (সাককান্যা) দেখা যায়। চাকমারা ঐ স্থানকে হাঙরকূল বলতো। এখনও সাতকানিয়ার পার্শ্বে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় উত্তর হাঙ্গর এবং দক্ষিণ হাঙ্গর নামে দু'টি মৌজা আছে। এ ছাড়া কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে পটিয়ার অনতীদূরে পুরাতন কর্ণফুলী সেতুর নিকটে শাকপুরা (চাকমা পুর?) নামে একটি বড়ুয়া গ্রাম এখনও আছে। ১৫৯৯ সালে আরাকানরাজা দক্ষিণ বার্মার পেগু শহরের বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরণ করেন তাতে একজন চাকমা রাজাও অংশ গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে Mr. G. E. Harvey সাহেব তাঁর লিখিত 'Bayinnaung's living descendant: The Mag Bohmoung' (Journal of Burma Research Society, Vol-XLIV. Part-1, pp 35-42, 1961) নামক একটি লেখাতে লেখেন 'A Thetmin Chief (Chakma Chief) was among the Arakanese commanders attacking Nanda-bayin (King of Burma) in 1599. He (Chakma Chief) drove off the Siamese who tried to join in looting Pegu." এ ঘটনার সময় প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের দৈং তাক-দের কথা জানা যায়। আরাকানী ভাষায় দৈং অর্থ ঢাল। 'তাক্' শব্দটি সম্ভবতঃ থাক্ (চাকমা) শব্দের বিকৃতরূপ। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ও চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশের উপর চাকমাররাজা রাজত্ব করছিলেন বলে মনে হয়। ১৬০৭ সালে আরাকান রাজা মাঙরাজাগ্রি (১৫৯৩-১৬১২ খৃঃ) চট্টগ্রামস্থ পর্তুগীজ নাবিক Philip de Brito Nicote কে একটি চিঠিতে নিজেকে the highest and the most powerful king of Arakan, of Chacomas and of Bengal" বলে পরিচয় দিয়েছেন, (Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol-XII, No. 3, P. 99, Dhaka 1967 দ্রঃ)। সে সময় থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় জুড়ে চাকমা রাজারা আরাকানের অধীনে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে চাকমারাজার নাম ছিল চন্দন খান (১৭১১ খৃঃ)। মোগলদের রেকর্ড পত্রেও তাঁর নাম পাওয়া যায়। তাঁর সম্পর্কে ডঃ এ, এম, সিরাজউদ্দীন সাহেব নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখেছেনঃ It was in 1711 A. C/1073 Maghi Era that one

Chandan Khan was elected as the first Raja by the suffrages of the hill people. His appointment was confirmed by the king of Arakan. Chandan Khan took the title of Tein Khan, his 'tein' or place of residence being 'to the southward of the hill of Joom Bungoo. (Pakistan Historical Society, Vol-XIX, Part-1, p. 52, Karachi 1971 দ্রঃ)। উল্লিখিত 'তৈন' অঞ্চল পরে মারমাদের কাছে এক সময় সম্ভবতঃ 'আলে-খ্যং-ডং' হিসাবে পরিচয় লাভ করেছিল, যা পরবর্তীকালে বিকৃত হয়ে আলী কদম নামে বর্তমানে পরিচিত হচ্ছে। চাকমা ইতিহাসকারেরা চন্দনখানের পিতার নাম রাজা সাথুয়া বড়ুয়া লেখে থাকেন (রাজা ভুবন মোহন রায়ঃ ১৯১৯)। ১৭১৫ সালে জলীল খান অথবা জালাল খান (১৭১৫-১৭২৪ খৃঃ) নামক একজন চাকমারাজা সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের মোগল কর্তৃপক্ষের সাথে পত্রযোগে যোগাযোগ করেবাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং ঐ বছর ১১ মণ কার্পাস শুল্ক হিসাবে তাঁদেরকে দেন। Dr. Alamgir Md. Serajuddin তাঁর লিখিত The rajas of the Chittagong Hill Tracts and their relations with the Mughals and the East India Company in the eighteenth century" (Journal of the Pakistan Historical Society, Vol-XIX, Part-1, Karachi 1971) নামক একটি লেখাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখেছেন, 'But in 1724 A. C./ 1086 M. E. on Jalal Khan's refusal to pay the tribute, he was attacked by the Mughal Diwan Kishan Chand; his abode was destroyed and he himself was put to flight to Arakan where afterwards died" এর পরবর্তীকালে ১৭৩৭ সালে আরাকানে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে সেরমুস্ত খান (১৭৩৭-৫৮ খৃঃ) নামক অপর একজন চাকমা রাজা আরাকানের পক্ষ ত্যাগ করে (সম্ভবতঃ কক্সবাজারের রামুর রাজারকূল থেকে এসে) মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর রাজত্বের সময় চাকমা রাজ দরবারে পূর্ব থেকে প্রচলিত ধাবেং, চেগে, থংঝা ইত্যাদি পদগুলি লুপ্ত হয় এবং তদস্থলে দেবান (দেওয়ান) পদ চালু করা হয়। সেরমুস্ত খানের সময় চাকমারাজার রাজ্যসীমা উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে শঙ্খনদীর মধ্যবর্তী স্থান, পূর্বে কুকিরাজ্য (লুসাই হিল) এবং পশ্চিমে নিজামপুর রাস্তা (ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড) পর্যন্ত ছিল (R. H. S. Hutchinson: 1909)। অতপর ১৭৬০

সালে ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাব মীর কাশিম আলী খানের কাছ থেকে চট্টগ্রামের শাসনভার লাভ করলে তারা স্বাভাবিক ভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব লাভ করেছিল। ১৭৭৬ সালে চাকমারাজা শেরদৌলত খানের সেনাপতি (জামাতা) রনু খাঁ দেওয়ানের সাথে ইংরেজদের বিরোধ দেখা দেয়। তখন রাজা শেরদৌলত খান রনু খাঁর পক্ষ নেন। এতে ইংরেজদের সাথে চাকমাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। রাজা শেরদৌলত খান (১৭৬৫-৮২ খৃঃ)-এর পুত্র জানবক্সখান (১৭৮২-১৮০০ খৃঃ) সম্পর্কে Mr. H. J. S. Cotton সাহেব Memorandum on the revenue history of Chittagong (1880, P. P. S) বইটিতে লেখেছেন, " .. .. .. the old records are full of Jan Bux and Runno Khan. Though Jan Bux was recorded as a Zemindar, he mantained his independance for many years, and was only reduced by a battalion of sepoys commanded by British officers, who pursued him to his fastness, and though they could not capture him, brought him to submission. This was in 1785." এ সময় চাকমাদের রাজধানী রাঙ্গামাটির ১৬ মাইল পশ্চিমে রানীহাটের অনতীদূরে রাজানগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ আমলে রানী কালিন্দীর সময় (১৮৩২-১৮৭৩ খৃঃ) তিনি রাজকার্যে দেবান (দেওয়ান)পদ তুলে দিয়ে তালুকদারপদ চালু করেন। এ পদটি ক্ষণস্থায়ী হয়।

১৮৬০ সালে বৃটিশরা সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করে কর্ণফুলী নদীর তীরে চন্দ্রঘোণায় জেলাসদর স্থাপন করে। উল্লেখ্য যে, চাকমাদের তৎকালীন রাজধানী রাজানগর থেকে চন্দ্রঘোণা খুব বেশী দূরে নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠনের পরে পরে বৃটিশরা এতদঞ্চলে সরকারী সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠনে করে এবং তারা পরবর্তীকালে (১৮৭০ সালের দিকে?) পার্বত্য চট্টগ্রামকে কতগুলি মৌজায় বিভক্ত করে প্রত্যেক মৌজায় একজন করে হেডম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা করে। এরফলে চাকমা সমাজ থেকে রাণী কালিন্দী কর্তৃক প্রবতিত তালুকদার পদটি লুপ্ত হয়। ১৯০০ সালে বৃটিশরা এই অঞ্চল শাসনের সুবিধার্থে- Chittagong Hill Tracts 1900 Act নামে নতুন একটি এ্যাক্ট চালু করে। ইতিমধ্যে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও মঙসার্কেল নামে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করেছিল। বলা বাহুল্য এতে রাণী

কালিন্দীর কর্তৃত্বাধীন একটি অংশকে নিয়ে ঐ সময় মণ্ড সার্কেল গঠন করা হয়েছিল। ১৮৬৮-৬৯ মালে জেলা সদর চন্দ্রঘোণা থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর করা হয়। এই সময় চাকমা রাজপরিবারও রাজানগর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে রাঙ্গামাটিতে বসবাসের জন্য চলে আসেন। ১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ঐ বছর ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐ সময় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পের উন্নতিকল্পে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাইনামক স্থানে বিরাট একটি বাঁধ দেয়। এতে ২৫০ বর্গমাইলের মত এলাকা জলমগ্ন হয় এবং বিরাট একটি কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয় যা কাপ্তাই হ্রদ নামে পরিচয় লাভ করেছে। এই বাঁধের ফলে হাজার হাজার লোক বাস্তহারা ও ভূমিহীন হয়। এদের ৯০% জনইচাকমা। ঐ সময় বহু চাকমা দেশান্তরিত হয়ে ভারতে চলে যায়। এবং সেখানে মিজোরাম, ত্রিপুরা ও অরুনাচলে বসতি স্থাপন করে কেউ কেউ হ্রদের চারিপাশে আনারস, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের বাগান গড়ে তোলে এবং অনেকে সরকারের কাছে নতুন জমি লাভ করে। এই সময় চাকমারা শিক্ষার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করে এবং কৃষি ক্ষেত্রেও কিছু কিছু উন্নতি করতে থাকে। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গণজাগরণ দেখা দেয়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। মুক্তি যুদ্ধের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ জনগণ মুক্তি যোদ্ধাদেরকে অর্থ, খাদ্যদ্রব্য ও আশ্রয় দিয়ে নানা ভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা দান করেছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পরে পরেই সদাশয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এতদঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এতে এখানকার সকল জন সাধারণ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে নিজেদের অবস্থার উন্নতির এবং দেশ সেবারসুযোগ পেয়েছে।

সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোঃ চাকমা সমাজের প্রধান হলেন চাকমারাজা। যুগ যুগ ধরে রাজাকে কেন্দ্র করেই চাকমা সমাজ আবর্তিত হয়েছে। সুদূর অতীতে ধাবেং, চেগে, খীসা পদাধিকারী ব্যক্তিরা রাজার অধীনে থেকে চাকমা সমাজকে শাসন করেছিলেন। পরবর্তীতে তাদের স্থলে আসেন প্রথমে দেবান (দেওয়ান)-এরা ও তৎপরে তালুকদাররা, তৎপরে হেডম্যান ও কার্বারীরা। এখন চাকমা সার্কেলের প্রধান হলেন

চাকমা চীফ অর্থাৎ চাকমা রাজা। তৎপরের স্থানে রয়েছেন মৌজা প্রধান হেডম্যানেরা। তাদের নীচের স্থানে রয়েছেন গ্রাম্য প্রধান 'কার্বারীরা। এই হলো চাকমাদের মোটামুটি সামাজিক কাঠামো।

এবারচাকমাদের পারিবারিক কাঠামোর কথায় আসা যাক। চাকমারা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক অর্থাৎ পরিবারের প্রধান হলেন পিতা। এরপরে মাতা এবং তৎপরে জেষ্ঠ্যপুত্র। চাকমাতে গুথি (গোষ্ঠী) বা বংশ গণনা করা হয় পিতার দিক থেকে অর্থাৎ কে কোন বংশের লোক তা পিতার সূত্র ধরেই নির্ধারণ করা হয়। চাকমা সমাজ এত বেশী পিতৃতান্ত্রিক যে পিতার সম্পত্তির উপর কেবল মাত্র পুত্র সন্তানদেরই উত্তরাধিকার রয়েছে। পিতা তাঁর জীবদ্দবশায় কন্যাদেরকে কোন সম্পত্তি দান করে না গেলে তারা কিছুই পায়না।

গঝা ও গুথিঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চাকমারা গোষ্ঠী বা গোত্র বা বংশকে 'গুথি' বলে থাকে। আর কতগুলি 'গুথি' মিলে অতীতে এক একটি 'গঝা' গঠিত হয়েছিল। চাকমা সমাজে গঝা ও গুথির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে গঝার চেয়ে গুথির গুরুত্ব অপরিসীম। স্বর্গীয় চাকমা লেখক বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান বান্দরবানের অধুনালুপ্ত ত্রৈমাসিক পত্রিকা ঝরণার ৩য় সংখ্যায় (১৯৬৭ ইং) 'চাকমা জাতির ইতিকথা' নামক প্রবন্ধে চাকমাদের নিম্নলিখিত গঝাগুলির নামলিপিবদ্ধ করেছেন– ১. ধামেই, ১. লার্মা, ৩. চেগে. ৪. বাবুর (অ), ৫, বুং, ৬. বগা, ৭. লেবা, ৮. ফাক্সা, ৯. মুলিমা, ১০. খ্যাংগি. ১১. চাদঙ (অ). ১২. ওয়াংঝা, ১৩. বোর্বুয়া, ১৪. রাঙী, ১৫. আঙু, ১৬. পুয়া, ১৭. তৈন্যা, ১৮. কাম্বি, ১৯ চেক্কব (অ), ২০. পেদাংশ্রী, ২১. ঐয়া, ২২. কুরাকুত্যা, ২৩. তেইয়া, ২৪. পুঙা, ২৫. কুদুগ (অ), ২৬. লক্ষর (অ). ২৭. উচ্ছুরী, ২৮. দার্জ্যা, ২৯. মুলিমা, ৩০. খ্যাং–চেগে, ৩১. দুখ্যা–চেগে. ৩২. বর–চেগে ইত্যাদি।

চাকমা সমাজে বিভিন্ন গুথিতে বিভিন্ন ধরনের টাবু (নিষেধ) দেখা যায়, যেমনঃ

১. লার্মা–গঝা/চার্জ্যা গোষ্ঠীর ঃ উনুনশালে একত্রে তিনটি চুল্লি তৈরি করা নিষেধ।

২. লার্মা–গঝা সাতভেইয়া গোষ্ঠীর : ভঙরাবিজি নামক বিচির মালা গলায় পরা নিষেধ।

৩. লার্মা–গঝা কবাল্যা গোষ্ঠীর এবং পিড়াভাঙা : মিষ্ঠি কুমড়োর শাক গোষ্ঠীর লাগানো নিষেধ।

৪. বোর্বুয়া–গঝা নাদুক্তুয়া গোষ্ঠীর : মিষ্টি–কুমড়োর শাক লাগানো নিষেধ।

৫. বোর্বুয়া–গঝা কালাবা–দাঘির : মোরগ এবং শুকর বিক্রি নিষেধ।

৬. বুং–গঝা বাঘওঝা গোষ্ঠীর : বন্য পুঁইশাক বাড়িতে আনা নিষেধ।

৭. তঞ্চঙ্গ্যা–মু–অ–গঝা তাচ্ছি গোষ্ঠীরঃ মন্দা শূকর বাজারে বিক্রি করা নিষেধ ইত্যাদি।

পূর্বে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের টাবুগুলো মেনে চলতো। তখন তাদের বিশ্বাস ছিলো গোষ্ঠীর কেউ টাবু ভঙ্গ করলে তার পরিবারের কাউ না কাউকে বাঘে ধরে খায়, অথবা তাদের নানাবিধ অমঙ্গল দেখা দিতে পারে। বর্তমানে এই সংস্কার চাকমাদের মধ্যে বিশেষত শহরে চাকমাদের মধ্যে লোপ পেয়েছে।

রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের সাবেক পরিচালক স্বর্গীয় অশোক কুমার দেওয়ানের মতে আরাকানী গঁং (মাথা) ও 'সা' (সন্তান, এক্ষেত্রে লোক) শব্দ দু'টি থেকে তঞ্চঙ্গ্যায় 'গসা' ও চাকমাতে 'গঝা' শব্দটি উদ্ভুত হয়েছে। নিম্নলিখিত গঝাগুলির নাম পদবী বাচক বলে বিশ্বাস করা হয়। যথা–ধাবাইংগ্রী>ধাবেং, চাইথুগ্রী>চাইথুগ্যি>চেগে. (বরচেগে, দুখ্যা চেগে, মুলিমা চেগে, খ্যাং চেগে) বড়ুয়া> বোর্বুয়া, লস্কর> লচ্চর, ওয়াং–ঝা, আমেঃগ্রি>আঙু ইত্যাদি। আবারকতগুলি চাকমা গঝা নদীর নামানুসারে হয়েছে বলে বিশ্বাস। এগুলি হলো– লামা নদী > লার্মা, মুরিমা (মাতামুহুরী) মুলিমা, তৈন্যাছড়ী> তৈন্যা, বোমু > বুং কুরাআঙুত্যা ছড়া> কুরাকুত্যা, ফাস্যাখালী > ফাক্সা ইত্যাদি।

মিঃ যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক পত্রিকা গিরিনির্ঝর ৩য় সংখ্যা (১৯৮২ ইং) তঞ্চঙ্গ্যাদের নিম্নলিখিত গসাগুলির নাম লিপিবদ্ধ করেছেন–১. মো, ২. কার্বুয়া, ৩. ধৈন্যা, ৪. মংগ্লা, ৫ . ওয়া. ৬ . মুলিমা, ৭ . রাঙী ইত্যাদি।

এবার চাকমাদের গুথিগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ বিষয়ে আমি ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত আমরা লিখিত 'বাংলাদেশের উপজাতি' নামক বইটিতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। নিম্নে তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেলঃ–

ক. শিশুর জন্মের সময় প্রসূতিকে স্বামীর ঘরে অথবা স্বামীর 'গুথি' বা বংশের কোন আত্মীয়ের ঘরে সন্তান প্রসবের জন্য নেয়াই রীতি। নিজের গুথির বাইরে অন্য লোকের ঘরে শিশু প্রসব করা চাকমাদের রীতি বিরুদ্ধ। এতে বংশ মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

খ। অতীতে চাকমা সমাজে স্বগোষ্ঠীতে সাত পুরুষ পর্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে এটি পাঁচ পুরুষে নেমে এসেছে। চাকমাদের রীতি অনুযায়ী কনেকে নিজেদের বাড়ীতে বা স্ববংশের কারোর কাড়ীতে এনে বিয়ে করাই রীতি।

গ। মৃতুর সময়ও চাকমাদের নিজেদের বাড়ীতে অথবা স্ববংশের কারোর বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করাই রীতি। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে চিতায় তার মরদেহ দাহ করা ব্যাপারে প্রথম মুখাগ্নি করার দায়িত্ব হলো তার ছেলের অথবা তার স্ববংশীয় রক্ত সম্পর্কীয় নিকট কোন আত্মীয়ের।

ঘ। চাকমাদের জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহে কোন অবস্থাতেই একজন পুত্র সন্তানের গোষ্ঠীর কোন পরিবর্তন হয়না। তবে বিয়ের পর মেয়েদের আর বাপের গোষ্ঠীতে গণনা করা হয় না। তারা তখন স্বামীর গোষ্ঠীর সদস্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

চাকমাদের সমাজে অসংখ্য 'গুথি' অর্থাৎ গোষ্ঠী রয়েছে। এ বিষয়ে স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র ঘোষ 'চাকমাজাতি' (কলিকাতা ১৯০৯ ইং) বইটিতে নিম্নলিখিত শতাধিক গোষ্ঠীর নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। যথা– ১. ধুর্য্যা, ২. কুর্য্যা ৩. ধাবানা ৪. পিড়াভাঙা ৫. নিনান্দ্যা ৬. কাঠ্যোয়া ৭. রামদালিকা ৮. মুলিখাজা (?) ৯. ভেলে ১০. কাত্তুয়া ১১. বোয়া (?) ১২. নানুকতুয়া ১৩. পোয়া কামার্জ্যা, ১৪. কোমরেং ১৫. নাদুকতুয়া

১৬. জান্দর ১৭. গুইয়া ১৮. তুদা ১৯. কাক্কিনা ২০. ফাট্টোয়া ২১. কয়ল্ ২২. ভিদিলী ২৩. ওয়াংঝা ২৪. গজাল ২৫. মুলিয়া ২৬ ফৈয়ব ২৭. কাঁকড়া, ২৮. শেঠ্যা ২৯. পুংঝা ৩০. কপাল্যা ৩১. খাট্যাল ৩২. কাশমানিক ৩৩. ইন্দুরতালা ৩৪. কালাপিলাবাপ, ৩৫. লোহাকন্দা, ৩৬. চেলীপুনা, ৩৭. মেন্দর, ৩৮. কালাবানজাঙি, ৩৯. মৈষচরা, ৪০. চর্কডা (?), ৪১ মিঠা, ৪২. নোয়ান্যা, ৪৩. কার্বুয়া, ৪৪. সিংহাসর্প, ৪৫. আনন্দ্যা (?) , ৪৬. কলা, ৪৭. রাঙাছিলন্যা, ৪৮. বাদালী, ৪৯. সেবার্য্যা, ৫০. সকুয়া, ৫১. মানিয়া, ৫২. চাদং, ৫৩. করম্যা, ৫৪. সল্যা, ৫৫. পঁচা, ৫৬. ইচাপঁচা, ৫৭. ক্ষাংথং (?), ৫৮. বামনচেগে, ৫৯. শেলপাত্যা, ৬০. শেলছ্যা, ৬১. বালকা, ৬২. বরৈবেচা, ৬৩. কলাচেম (?) ৬৪. কাণ্ড, ৬৫. তিনভেদা, ৬৬. বড়কুর্য্যা, ৬৭. ছোটকুর্য্যা, ৬৮. গোদা, ৬৯. মঘ, ৭০. সিঙিরাপুনা, ৭১. লুলাং, ৭২. ভুরুমা, ৭৩ বহ্লা, ৭৪. বান্যাব (?), ৭৫. চৈদানী, ৭৬. চানৈ, ৭৭. দোজা ৭৮. সমৃসর্দ্দার, ৭৯. কাগুনিকাল, ৮০. রেৎকাবা, ৮১. নেন্দাব, ৮২. সুরেশ্বরী, ৮৩. তেতৈয়া, ৮৪. আউনাপুনা, ৮৫. কাউয়া, ৮৬. ভদং, ৮৭. ভূত, ৮৮. ক্যকদড়া, ৮৯. অমরী, ৯০. আমু, ৯১. পার্বোয়া, ৯২. জাদি, ৯৩. সরইয়া, ৯৪. বরৈয়া, ৯৫.. ভেঙেয়া, ৯৬. লৌহঝাত্তোয়া, ৯৭. বুংচেগে, ৯৮. কাল (?), ৯৯. চেগে, ১০০. ভুলা, ১০১. কালাবাঘা, ১০২. পিঙরভাঙা, ১০৩. ভবা, ১০৪. তদেগা. ১০৫. সামঝা, ১০৬. সাতভাইয়া, ১০৭. পেডংছারী, ১০৮. জাল্যা, ১০৯. সল্যা, ১১০. চাওন্যা, ১১. হাগরা, ১১২. হাতী (?), ১১৩. বাঘ ওঝা, ১১৪. করেংগিরি, ১১৫. আগুনিকনা ১৬. রাককোয়া বাপ, ১১৭. নাদকতুল, ১১৮. সর্দ্দার, ১১৯. শেষ্যা, ১২০. রসিরী, ১২১. বাবুরা, ১২২. গজাল্যা. ১২৩. মানাইয়া, ১২৪. ভগতপ ইত্যাদি।

ধর্মঃ চাকমারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্মের হীনযান মতের অনুসারী তারা বৈশাখী পূর্নিমা, আষাঢ়ী পূর্নিমা, মাঘীপূর্নিমা, কার্ত্তিকী পূর্নিমা ইত্যাদি দিবসে বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে বুদ্ধপূজা, ত্রিশরণ গ্রহণ, পঞ্চশীল গ্রহণ, চীবরদান ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি করে থাকে। পূর্বে চাকমা সমাজে 'লুরি' বা 'রুরি' (রাউলী) নামক এক শ্রেণীর বৌদ্ধ পুরোহিত ছিলেন। তাঁদের ধর্মগ্রন্থের নাম আঘরতারা। এগুলি চাকমা বর্ণে বিকৃত পালি ভাষায় রচিত সূত্র। অধুনা হীনযানপন্থী বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রভাবে চাকমা সমাজ থেকে লুরিরা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। রানী কালিন্দীর সময় আরাকান থেকে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির এবং হারবাং থেকে গুনামেজু নামক দুইজন জ্ঞানী

বৌদ্ধভিক্ষু এসে চাকমাদের মধ্যে প্রথম বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান মত প্রচার করেছিলেন। বর্তমানে রাঙ্গামাটিতে রাজবন বিহারে সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে) প্রতিদিন অগনিত দায়কদায়িকাকে ধর্ম দেশনা করে তাদের হিতসাধন করছেন।

এ ছাড়া বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান বৌদ্ধ ভিক্ষু রাঙ্গীমাটিতে 'মোনঘর' নামক একটি অনাথ আশ্রম নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে বহু অনাথ শিশুর উপকার করছেন।

পূজা, পার্বন ও উৎসবঃ চাকমা সমাজে অতীতে বহু পূজা, পার্বণ ও উৎসব প্রচলিত ছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভাতদ্যা, থানমানা, হালপালনি, ধর্মকাম ওইয়াপূজা, বিঝু উৎসব ইত্যাদি। তবে বৃটিশ আমলের শেষের দিকে চাকমা সমাজ থেকে 'ভাতদ্যা পূজা' শেষবারের মত উঠে যায়। থানমানা পূজাও পাকিস্তান আমলের পরে গ্রামগুলিতে আর দেখা যাচ্ছে না। এখন বিঝু উৎসবটিই দিন দিন চাকমা সমাজে সগৌরবে উদযাপিত হচ্ছে। এগুলি সম্পর্কে নীচে কিছু ধারণা দেওয়া গেল।

ভাতদ্যাঃ পূর্ব পুরুষদের আত্মার সদগতি কামনা করে এবং মৃত্যুর পরে কে কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছে তা নির্ণয়ের জন্য অতীতে চাকমাদের বিভিন্ন গোত্রগুলি এক একটি নির্দিষ্ট দিনে ভাতদ্যা পূজার আয়োজন করতো। এতে গোত্রের প্রধান নেতৃত্ব দিতেন এবং গোত্রের সদস্যরা প্রত্যেকে নিজেদের মৃত পূর্ব পুরুষদের নামের তালিকা (সাত পুরুষ পর্যন্ত) গোত্র প্রধানের কাছে জমা দিতেন। ভাতদ্যা পূজার সময় ঐ সকল মৃতব্যক্তিদের প্রত্যেকের নামে এক একটি পাতে খাবার সাজানো হতো। লুরিরা উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য ও মন্ত্রপাত করতেন। ঐ পূজায় কোন ব্যক্তি মুমূর্ষু ও ক্রন্দনরত অবস্থায় কোন মৃতব্যক্তির নাম শুনে সুস্থ হলে সে পূর্ব জন্মে ঐ মৃতব্যক্তিটি ছিল বলে ধরে নেওয়া হতো। তখন তাকে ঐ মৃতব্যক্তির নামে সাজানো খাবার দেওয়া হতো। সে তা থেকে কিছু খেয়ে সুস্থ হলে পূর্বজন্মে মৃত্যুর সময় তার ঐ জিনিষের প্রতি তৃষ্ণা ছিল বলে ধরে নেওয়া হতো। ভাতদ্যা পূজা মূলতঃ পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যেই করা হতো।

থানমানাঃ পূর্বে গ্রামের মঙ্গলের জন্য কোন কোন গ্রামবাসীরা সবাই বছরে একটি দিন নদীতীরে একত্র হয়ে বেশ কয়েকজন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পূজার আয়োজন করতো। এতে গ্রামের ওঝারা পুরোহিত্য করতেন। তারা ঐ সকল দেবদেবীদের উদ্দেশ্য

পশুপাখি বিশেষতঃ শূকর, ছাগল, মোরগ, মুরগী ইত্যাদি বলি দিয়ে মন্ত্রপাত করতেন পূজা শেষে গ্রামের সবাই মিলে সেখানে ভোজের আয়োজন করতেন।

হালপালনীঃ আষাঢ় মাসের ৭ তারিখ গ্রামের বিশেষতঃ গৃহবধূরা মা-লক্ষ্মীমা' নামক দেবীর উদ্দেশ্যে খানা দিয়ে এবং বলদগুলিকে ঐদিন কৃষিকাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে হালপালনী উৎসব উদযাপন করে। এটি এখনও গ্রামদেশে প্রচলিত রয়েছে।

ধর্মকামঃ গৃহস্থের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য ধর্মকাম পূজা করা হয়। এতে লুরিরা পৌরহিত্য করেন। কলাপাতায় মুড়িয়ে ভাততরকারী দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। উক্ত খাবারে অবশ্যই মাকড়সার আগমন ঘটে বলে চাকমাদের বিশ্বাস।

বিঝু উৎসবঃ চাকমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের নাম বিঝু উৎসব। বাংলা বর্ষের শেষ দিন-'মূলবিঝু', তার আগের দিন 'ফুলবিঝু' ও পরের দিন অর্থাৎ প্রথম দিনকে 'গোর্জ্যা পোজ্যা' দিন বলা হয়। ফুল বিঝুর দিন শিশুরা নদীতে কলাপাতায় করে ফুল ভাসিয়ে দেয় ও ফুল দিয়ে বাড়ী ঘর সাজায়। মূল বিঝুর দিন প্রতিটি বাড়ীতে অতিথিদেরকে নানাবিধ খানাপিনা দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। এতে বিভিন্ন তরকারী দিয়ে পাজোন নামক ব্যঞ্জন (পাঁচন) রান্না করা হয় ঐ পাজোনে তিক্ত, মিষ্ট সকল স্বাদের খাদ্য উপাদান থাকে। চাকমাদের বিশ্বাস বছরের শেষ দিন তিতা-মিঠা সকল স্বাদের খাবার খেয়ে বর্ষ বিদায় করা ভাল। ঐদিন তরুণীরা অনেকে বুড়োবুড়ীদেরকে নদী থেকে জল তুলে স্নান করিয়ে তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। সদ্য বিবাহিত বরকনেরা বাপের বা শ্বশুর বাড়ীতে বেড়াতে যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভোরে গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে মুরগীদেরকে খুদ্ (ধান, চাল ইত্যাদি) দেয়। সারাদিন গ্রামে ও শহরে অনেক আমোদ ফূর্ত্তি হয়। পরদিন শুরু হয় গোর্জ্যাপোজ্যা বা নববর্ষ। এই দিনটি চাকমা সমাজে মূলতঃ বিশ্রামের দিন অনেকটা ছুটির দিনের মত। নববর্ষের দিন লোকজন বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে ফুল ও প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধকে পূজা করে এবং বৌদ্ধভিক্ষুদেরকে প্রনাম জানিযে তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে এইদিন অনেকে বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে খানা খাওয়ায় ও তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। এইদিনও বাড়ীতে অতিথিদেরকে খাদ্য পানীয় দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। আর এভাবেই চাকমারা নববর্ষকে স্বাগত জানায়।

এবার চাকমাদের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনা করা যাক।

জন্মঃ কোন পরিবারে শিশুর জন্ম হলে, শিশুটিকে জল দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর তার মুখে মধু দেওয়া হয়। মা ও শিশুকে বিশেষ কক্ষে রাখা হয়। এর সাত দিন পরে 'ঘিলা-কজই পানি, মাথায় উপর ছিটিয়ে প্রসূতিকে ও শিশুটিকে পবিত্র করানো হয়। এক জাতীয় পিঙ্গল রঙের বিচির নাম' ঘিলা" আর 'কজই' হলো এক প্রকার হলুদ জাতীয় দ্রব্য। এ সময় ধাত্রীকে পারিশ্রমিক হিসাবে উপযুক্ত অর্থ ও নতুন কাপড় দেওয়া হয়। মাস খানেক পরে বাড়ীতে নাপিত ডেকে শিশুটির চুল মুড়িয়ে দেওয়া হয়। তার আগ পর্যন্ত মা ও শিশুটির অন্য কোন লোকেরবাড়ীতে যাওয়া নিষেধ।

বিবাহঃ চাকমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমি আমার লিখিত 'চাকমা পরিচিতি' (রাঙ্গমাটি ১৯৮৩ ইং) এবং 'বাংলাদেশের উপজাতি' (ঢাকা ১৯৮৫ ইং) বই দু'টিতে বিস্তারিত ভাবে লিখেছি। নীচে এ বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল। আনুষ্ঠানিক বিয়ের সময় পাত্রের পিতামাতা বা অভিভাবকেরা (সাধারণতঃ পাত্রের পছন্দমত) তিনবার পাত্রীর বাপের বাড়ীতে কনে দেখতে যায়। প্রতিবারই তারা তাদের সাথে নানা ধরণের পিঠা, পানীয়, নারকেল, পানসুপারী ইত্যাদি নিয়ে যায়। তবে তৃতীয়বার যাওয়ার সময় তারা রীতি অনুযায়ী পাত্রীর বাবার জন্য অবশ্যই মদের বোতল নিয়ে যায়। এটাকে 'মদ-পিলাং' অনুষ্ঠান বলে। এই দিনই বিয়ের চূড়ান্ত দিন ধার্য করা হয় এবং বরপক্ষ কনেকে কি কি গয়নাগাটি ও পোশাক পরিচ্ছদ দেবে তা ঠিকঠাক করা হয়। বিয়ের দিন বরের বাড়ীর সদর দরজার দু'পাশে দু'টি কলাগাছ লাগানো হয় এবং দু'টি কলসীতে ঢাকনাসহ জল পূর্ণ করে রাখা হয়। ঐ ঢাকনা দু'টির উপর প্রদীপ জ্বালানো হয়। কলসী দু'টির গলায় একটি সাদা সূতা দিয়ে সাতবার পেঁচিয়ে সেতুবন্ধন তৈরী করাহয়। বরযাত্রীরা যথা সময়ে (সাধারণতঃ সকালে) কনের বাড়ীতে রওনা হয়। তারা সেখানে পৌছঁলে তাদেরকে সাদরে আপ্যায়িত করা হয়। সেখানে কনেকে নতুন বস্ত্রালংকার দিয়ে সাজানো হয়। অতপর কনে পিতামাতা ও অন্যান্য উপরিস্থ আত্মীয় স্বজনদের পদধূলি গ্রহণ করে তাদের আর্শীবাদ গ্রহণ করে। এরপর বরযাত্রীরা সেখান থেকে কনের বাড়ীতে রওনা হয়। তারা বরের বাড়ীর প্রাঙ্গনে পৌছলে কনের হবু ননদ বা দেবর সম্পর্কের একজন আত্মীয় এসে জল দিয়ে তার পা ধুয়ে দেয়। তখন বরের মা একটি সূতারপ্রান্ত ধরে প্রথমে হাঁটেন ও তার পিছনে পিছনে কনে সূতার অপর প্রান্ত তার কড়ে আঙ্গুলে জড়ানো অবস্থায় ধরে সদর দরজা দিয়ে বয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করে। বলাবাহুল্য তাকে পূর্বোক্ত দু'টি কলসীর মাঝের সাতনাল সূতা ডিঙিয়ে বরের বাড়ীতে

শুভ প্রবেশ করতে হয়। বিয়ের আসরে বর ও কনে পাশাপাশি বসে এবং বরের বাম পাশে কনেকে বসানো হয়। একজন ছায়লা বা ছায়লী উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেন, "জরা বানি দিবার হুগুম আঘেনি?" (অর্থাৎ জোড় বেঁধে দেওয়ার হুকুম আছে কি?)। সবাই "আঘে আঘে" অর্থাৎ "আছে আছে" বললে ছায়লা বা ছায়লী একটি শুভ্র বস্ত্র নিয়ে বর ও কনের কোমরে জড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে যুক্ত করেন। এই অনুষ্ঠানকে চাকমা ভাষায় 'জরা-বানানা' বলে। ঐ অনুষ্ঠানে একটি থালায় বর ও কনের জন্য ভাত, ডিম ইত্যাদি আনা হয়। রীতি অনুযায়ী বরকে নিজের হাতে কনের মুখে ডিমমাখা ভাত ও অন্যান্য খাবার তুলে দিতে হয় এবং কনেকেও অনুরূপ ভাবে বরের মুখে খাবার তুলে দিতে হয়। একই ভাবে খিলিপানও পরস্পর পরস্পরকে খাইয়ে দিতে হয়। এই সময় উপস্থিত দর্শকরা খুব মজা পায়। এই অনুষ্ঠানের পর 'চুঙুলাং' পুজা করতে হয়। এই পূজায় ওঝা পৌরোহিত্য করেন। পূজায় দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকে বলি দেওয়া শূকরের মাথা, রান, মোরগ-মুরগী চাল, ডিম ইত্যাদি কলাপাতার উপর সাজানো থাকে। ঐ পূজার জন্য কনেকে জলের কলসী নিয়ে নদী বা কূয়া থেকে জল নিয়ে আসতে হয়। ওঝা ঐ জলে মন্ত্রপূত মদ একটুখানি ছিটায়। বর ও কনে পূজায় দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায় এবং ঐ পবিত্রজল উভয়ে পান করে। তখন তারা স্বামীস্ত্রী হিসাবে পরিণত হয় ও উপরিস্থ আত্মীয় স্বজনদেরকে প্রণাম জানিয়ে তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। তারা বীজযুক্ত তুলা ও চাল নবদম্পত্তির মাথায় ছিটিয়ে তাদের আশীর্বাদ করেন। অধুনা অনেকে সাত-জাতের অর্থাৎ সাত জাতীয় ফুল দিয়েও চুঙুলাং পূজা সম্পাদন করে থাকে। এর পর অতিথিদেরকে খানা পিনা দিয়ে ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। উল্লেখ্য যে, চাকমা সমাজে চাচাতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং পুরুষেরা মাসী-পীসি, ভাগ্নী-ভাইঝি ইত্যাদি সম্পর্কের আত্মীয়াকে বিয়ে করতে পারেনা। তারা যে কোন অনাত্মীয়াকে. এবং মামাতো, ফুফাতো, খালাতো বোনদেরকে বিয়ে করতে পারে। চাকমা সমাজে বহু স্ত্রী গ্রহণে বাধা না থাকলেও চাকমারা সাধারণতঃ এক স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে।

মৃত্যুঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে অতীতে ঐ বাড়ীতে রুরিরা আঘরতারা পাঠ করতেন। বর্তমানে আর তা করা হয় না। গ্রাম দেশে মৃতের বাড়ীতে বিশেষ একটি তালে ঢোল বাজানো হয়। এ থেকে গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে ঐ বাড়ীতে কোন লোকের মৃত্যু হয়েছে। তখন গ্রামবাসীরা তাদের বাড়ীর সদর দরজার সামনে এক

একটি পাত্রে (সাধারণতঃ মাটির পাত্রে) তুষের উপর অঙ্গার দিয়ে আগুন জ্বেলে রাখে। কোন অপশক্তি যাতে তাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে এই জন্য এই ব্যবস্থা। এরপর তারা মৃতের বাড়ীতে খোঁজ নিতে যায়। চাকমারা বুধবার বাদে অন্য যে কোন দিন মৃতদেহকে দাহ করে। মৃতদেহকে দাহ করার আগে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয়। আত্মীয় স্বজনেরা মৃতের বুকে টাকা পয়সা দান করে। এগুলি পরলোকে তার প্রয়োজন হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। মৃতকে বাড়ীর বাইরে নেওয়ার সময় প্রথমে তার পায়ের দিক বাইরে নেওয়া হয়। অতপর মৃতকে বাড়ীর প্রাঙ্গনে একটি বাহনে রাখা হয়। মৃত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হলে তার কনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনেরা তার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। মৃত পিতা বা মাতা হলে তার বাম পায়ের একটি আঙ্গুলে ৭ নালযুক্ত একগাছি সূতা পেঁচানো হয় এর অপর প্রান্ত তার সন্তানেরা ধরে। একজন ওঝা ধারাল কিছু দিয়ে ঐ সূতার গাছি কেটে দিয়ে তা ছিন্ন করে। এতে মৃতের সাথে তার পরিবারের অন্যান্য জীবিত সদস্যদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় বলে ধরা হয়। এরপর মৃতকে রক্ষিত বাহনটিকে কাঁধে নিয়ে তার আত্মীয়েরা শ্মশানে যায় এবং তাকে চিতার উপর দাহ করার জন্য তুলে দেয়। মৃত পুরুষ ব্যক্তি হলে চিতায় ৫ স্তর লাকড়ি ও স্ত্রীলোক হলে ৭ স্তর লাকড়ি সাজানো হয়।

এরপর তার সন্তানেরা (আত্মীয়েরা) লাকড়িতে আগুন ধরিয়ে চিতার চারিদিকে সাত পাক ঘুরে মৃতের শিয়রের দিকে আগুন দেয়। রীতি অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা অনুসারে পুত্র সন্তানেরা প্রথম পিতার বা মাতার চিতায় আগুন দেয়। এরপর অন্যান্যরা চিতায় আগুন দেয়। বর্তমানে মৃতদেহকে চিতায় দাহ করার সময় তার শির উত্তর দিকে রেখে দাহ করা হয়। শ্মশান থেকে ফিরার পথে লোকেরা নদীতে স্নান করে বা শিরে পানি ছিটিয়ে পরিত্র হয়। তারা বাড়ীতে গিয়ে করলার বা তিতা জাতীয় কোন শাক (রেঁধে) খায় অথবা তার ঝোল খায়। যাতে ঐ জাতীয় কোন তিক্ত ঘটনার আর সাক্ষাৎ না হয় এইজন্য তারা তিতা জাতীয় খাদ্য খায়। পরদিন মৃতের পুত্রেরা শ্মশানে গিয়ে চিতার ছাইভস্ম নদীতে ফেলে পরিষ্কার করে। তারা মাটির তৈরী একটি নতুন পাত্রে চিতা থেকে মৃতের অস্থি ও সামান্য ছাইভস্ম নিয়ে নতুন কাপড় দিয়ে পাত্রটির মুখ বন্ধ করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। একে 'হার-ভাঝানা (হাড়-ভাসানো) বলে। এরপর অনেকে চিতার চারকোনায় ৪টি বাঁশ পুঁতে এদের মাথায় একটি সাদা চন্দ্রাতপ উড়িয়ে দেয়। কেউ কেউ চিতার চারপাশে বাঁশের মাথায় সাদারঙের লম্বা কাপড় ঝুলিয়ে দেয়।

এগুলিকে তাংগোন বলে। অতপর মৃতের পুত্রেরা বাড়ীতে নাপিত ডেকে চুল মুড়িয়ে ফেলে। এতে বিপদ আপদ দূর হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। অতপর সপ্তাহ অন্ত্যে বাড়ীতে বৌদ্ধভিক্ষু আমন্ত্রণ করে এনে মঙ্গল সূত্র শ্রবণ করা হয় এবং মৃতের সদগতি কামনা করে তার উদ্দেশ্যে নানা সামগ্রী, অর্থ ইত্যাদি দান করা হয়। শ্রাদ্ধের সময় বৌদ্ধভিক্ষুদেরকে ভোজন করানো হয় এবং উপস্থিত সকলকে মৃতের সদগতির উদ্দেশ্যে খানা দেওয়া হয়।

গ্রাম, বাসগৃহ ও কুটির শিল্পঃ চাকমারা গ্রামকে 'আদাম' এবং বাসগৃহকে ঘর বলে। সাধারণতঃ নদীর তীরে ছোট খাটো পাহাড়ের উপর খোলামেলা জায়গায় চাকমা গ্রামগুলি হয়ে থাকে। চাকমারা খুঁটির উপর যে ঘর তৈরী করে তাকে মজাঘর (মাচাং ঘর) বলে। ঐ মাচাং ঘরগুলিতে উঠার জন্য যে বাঁশ বা গাছের যে সিড়ি থাকে তাকে সাঙু বলে। এরপর বাঁশনির্মিত একটি মাচা (প্ল্যাটফর্ম)। একে 'ইজর' বলে। এখানে জলের পাত্রগুলি রাখা হয়। ঘরে ঢুকে প্রথমে যে খোলামেলা কক্ষটি পাওয়া যায় তাকে 'চানা' বলে। চানার এক কোণে মাটির প্ল্যাটফর্মের উপর যে তিনপায়া চুল্লি থাকে তাকে 'পাহ্ বলে। চানাতে শিশুদের জন্য দোলনা থাকে। এরপর ঘুমানোর কক্ষগুলি। এগুলিকে চাকমারা 'গুদি' বলে। সবশেষে ঘরের পিছনের কক্ষ। এটিকে 'ওজলেং' বলে। অনেকে এটিকে Store room হিসাবেও ব্যবহার করে।

চাকমারা বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি, চিরুনী, দোলনা, ফাঁদ ইত্যাদি তৈরী করে। তাদের তৈরী বিশেষ এক জাতীয় ঝুড়ি ফুলবারেং, ফুনি (চিরুনী) ও বাঘ মারার ফাঁদ 'কাবুক' দেখতে বেশ চমৎকার। চাকমা মেয়েরাও 'বেইন' নামক কোমর তাঁতে সুন্দর সুন্দর 'পিনোন' (এক ধরনের স্কার্ট), 'খাদি' (বক্ষবন্ধনী), ওড়না, চাদর ও অন্যান্য কাপড় চোপড়, তৈরী করে। চাকমা মেয়েদের ডিজাইন ক্লথের নাম 'আলাম'। এতে নানা জাতীয় ফুল, পাতা, বৃক্ষ ও পশুপাখির চোখ, পদচিহ্ন ইত্যাদির চিহ্নযুক্ত নকশা থাকে।

শিকার ও খ্যাদ্যাভাসঃ পূর্বে চাকমা সমাজে শিকারের ব্যাপারে একটি রীতি ছিল। কোথাও বনে কেউ কোন প্রাণী যেমন শূকর বা হরিণ শিকার করলে ঐ শিকারটির রাণ রাজাকে দিতে হতো। যদি ঐ স্থান থেকে রাজবাড়ী দুরে হতো তবে রাজা কর্তৃক অধিকারপ্রাপ্ত ঐ এলাকার হেডম্যানকে ঐ রাণ খেতে দেওয়া হতো।

শিকারী তার কৃতীত্ব স্বরূপ শিকারটির মাথা পেয়ে থাকে। রীতি অনুযায়ী যে ব্যক্তি প্রথম ঐ শিকারীটর খোঁজ পায় সেও শিকারটির এক ভাগ পায়। যাদের বন্দুক শিকারে ব্যবহার করা হয় তারাও শিকারটির ভাগ পায়। শিকারে অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তিরই শিকারটির মাংসের ভাগ পেয়ে থাকে।

এবার খাদ্যের কথায় আসা যাক। চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তারা ভাতের সাথে মাছ, মাংস এবং প্রচুর পরিমানে শাকসবজি খায়। চাকমাদের খাদ্যের মদ্যে শূকর, কাকড়া, ব্যাঙ, শামুক মুরগী এবং বাঁশকোড়লের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চাকমারা প্রচুর পরিমাণে নানা জাতীয় শাকসবজি খায় এবং অনেকে ঝাল খেতে ভালবাসে। তারা জুমে উৎপন্নজাত ফুঝি, সাবারাং, বাগোর ইত্যাদির কাচামশলা তরকারীতে ব্যবহার করে। কেবল লবণ, হলুদ, শুটকী ও সবজী নিয়ে সিদ্ধ করে বিশেষ এক জাতীয় রান্না করা তরকারীকে চাকমারা 'তাবাদ্যা তোন' বলে। এই জাতীয় রান্না স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। কচিকলাপতায় শুটকী রেখে রান্না করা তরকারীকে চাকমারা 'কেবাং' বলে। আর কেউ কেউ সবুজ চোঙ্গার মধ্যে ছোট মাছ জাতীয় তরকারী রান্না করে। অথবা রান্নার পর গুঁড়ো করে খেতে ভালবাসে। এ জাতীয় তরকারীকে 'চুমাত রান্যা-তোন' বা 'চুমাতগুদেয়া-তোন' বলে।

জুম চাষঃ পাহাড়ের ঢালু অংশে বনজঙ্গল কেটে সেগুলি রোদে শুকানোর পর ঐ গুলি পুড়িয়ে সে স্থানে যে চাষ করা হয় তাকে জুম চাষ বলে এবং ঐ ক্ষেত্রটিকে 'জুম' বলে। প্রথমে ভালভাবে ঐ স্থান থেকে পুড়ে যাওয়া গাছ বাঁশগুলি সাফ করা হয়। তারপর সেখানে 'তাগল' নামক এক জাতীয় চুঁচালো দা দিয়ে ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে সে গুলিতে ধান ও অন্যান্য ফসলের বীজ বপন করা হয়। বৃষ্টির পরে তাতে চারা গজায়। চারাগুলি বড় হলে ঐ স্থানের আগাছা সাফ করা হয়। ধান ও অন্যান্য ফসল পাকলে ঐগুলি 'কাল্লোঙ' নামক একপ্রকার ঝুড়িতে সংগ্রহ করে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। অতীতে এখানকার উপজাতীয়দের একমাত্র চাষই ছিল জুমচাষ। প্রকৃত পক্ষে 'জুম'কে ভিত্তি করে এখানকার চাকমাসহ সকল উপজাতীয় সমাজ গড়ে উঠেছিল।

ভাষা, বর্ণ, সাহিত্য ও খেলাধূলাঃ চাকমাদের ভাষা Indo-Aryan বা হিন্দ আর্য শাখার অন্তর্ভূক্ত। লেখার জন্য চাকমাদের নিজস্ব বর্ণ আছে।এগুলির সাথে দক্ষিণ ভারতের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর বর্ণগুরির যোগসূত্র ও মিল রয়েছে। বিখ্যাত

ভাষাতাত্ত্বিক Dr. G. A. Grierson তাঁর লিখিত Linguistic Survey of India (Vol-V, Part-1, P. 32G, Calcutta ১৯০৩) বইটিতে লেখেছেন, 'The Burmese Character is Derived from it (Chakma), but is much more corrupted than the Chakma". চাকমাদের মধ্যে রাধামন-ধনপুদি, চাদিগাঙ ছাড়া ইত্যাদি নামের বেশ কিছু ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি রয়েছে। এগুলি গেংগুলী নামক চারণকরিরা বাঁশী বা বেহালা নিয়ে 'উভাগীত' নামক বিশেষ সুরে গ্রামদেশে গেয়ে থাকে।

আধুনিক চাকমা সাহিত্যও বর্তমানে বেশ এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে চাকমা ভাষায় কবিতা ও নাটকসহ বই প্রকাশিত হয়েছে এবং রাঙ্গামাটিতে বেশ কয়েকটি চাকমা নাটক মঞ্চস্থ হয়ে শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে চাকমা গানগুলিরও জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।

এবার খেলাধূলার কথায় আসা যাক। চাকমাদের মধ্যে বহু ধরণের খেলাধূলা আছে। যেমন গুদুখারা (হাডুডু), পোরখারা (দৌড়িয়া বান্ধা) বলিখারা (কুস্তি), ঘিলাঘারা, নাধেং খারা (লাটিম (খেলা) ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে ঘিলা নামক এক প্রকার বিচিকে নিয়ে যে ঘিলাখারা বা ঘিলাখেলা হয় তাতে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়।

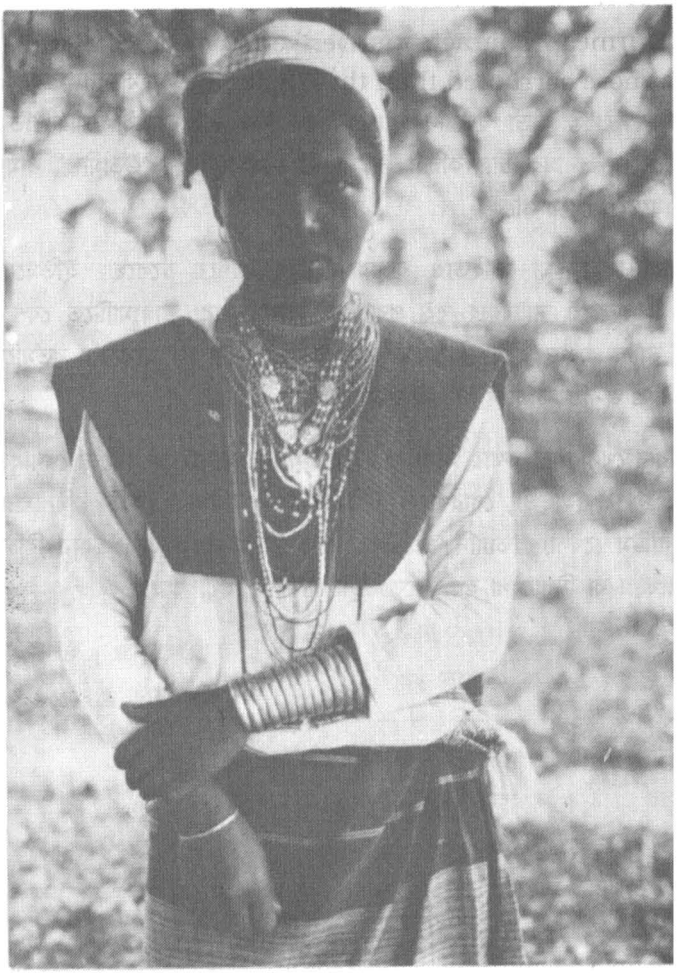

তঞ্চঙ্গা রমনী

মারমা

মারমা তরুনী

মারমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতির নাম মারমা (Marma)। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারী রিপোর্ট থেকে ঐ সময় এখানে মারমা পরিবারগুলির সংখ্যা ২২,৫২০ টি ছিল বলে জানা যায়। উক্ত আদমশুমারীর সময় প্রতি পরিবারের ৫.৭৫ জন লোক ধরা হয়েছে। এ থেকে ঐ সময় এখানে মারমাদের জন সংখ্যা অনুমানিক ১,২৯,৪৯০ জনের মত ছিল বলে জানা যায়। মারমারা বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি। এখানে বান্দরবান শহরে তাদের সমাজের প্রধান বোমাং রাজা বাস করেন। তিনি হলেন বোমাং সার্কেলের প্রধান। আবার খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়ও মঙ সার্কেলের ভূতপূর্ব প্রধান মঙরাজাও মারমা ছিলেন। সেখানে মানিকছড়িতে তাঁর রাজবাড়ীটি অবস্থিত।

মারমা নামের উৎপত্তি ও বোমাং রাজপরিবার ঃ মারমা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে মিঃ ক্যাশেপ্র, অঙ্কুর (১ম সংখ্যা, রাঙ্গামাটি ১৯৮১ ইং) নামক সাময়িকীতে 'মারমা উপজাতি পরিচিতি' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেছেন, "মারমা শব্দটি ম্রাইমা শব্দ থেকে উদ্ভূত।" উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে মারমারা অনেকের কাছে 'মগ' নামে পরিচিত ছিল। বোমাং রাজপরিবার সম্পর্কে Mr. R. H. S. Hutchinson সাহেব Chittagong Hill Tracts district gazetteer, 1909 (reprinted in Delhi 1978)-এ লেখেছেন " In 1599 A.D. the King of Burma sent two ambassadors by Kindonja and Tachaja, with presents to Manrajagiri, King of Arakan, requesting his aid against the king of Pegu; he promised great rewards in the event of the success of the expedition. The assistance was readily given and victory followed, the King of Arakan was awarded 33,000 families of Talaing subjects together with the son and daughter of the vanquished king of Pegu. The Arakanese

king became enamoured of his fair young captive and married her and in 1614 deputed his brother-in-law to govern Chittagong." মিঃ ক্যাশেপ্রু পেগুর উক্ত রাজপুত্রের নাম মংচপ্যাই এবং রাজকন্যার নাম সাই-ড-হ্নাং লেখেছেন। উল্লেখ্য যে, বান্দরবানের বোমাং রাজপরিবারের সদস্যরা নিজেদের পেগুর রাজপুত্রের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। (G.E. Harvey : 1961 দ্রঃ) Mr. Maurice Collis তাঁর লিখিত The Land of great image (New Youk, ১৯৪১) বইটিতে লেখেছেন যে, পাদ্রী Manrique এর সাথে ১৬৩০ সালে পেগুর রাজকন্যার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আরকানী লেখকদের লেখা থেকে জানা যায় যে, পেগুর রাজকন্যার অনুরোধে আরাকানরাজা মাঙরাজাগ্রি ১৬১২ সালে পেগু থেকে আনীত বন্দীদেরকে ১২টি 'থং' এ বিভক্ত করে আরাকান রাজ্যে রেখেছিলেন । উল্লেখ্য যে, আরকানী ভাষায় খং শব্দের অর্থ হাজার। Mr. R.H.S. Hutchinson বোমাং রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ হারিও এর বোমাংগ্রি উপাধি লাভ সম্পর্কে লেখেছেন, "After three successions, Hario, the son of Angunya, became Govermor of Chittagong, in 1710 he met Ujia, the King of Arakan, and received the title of Bohmongri." হারিও এর নাতি কং হ্লাফ্রু মোগলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ১৭৫৬ সালে আরকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে থেকে পুনরায় ১৭৭৪ সালে তিনি এদিকে এসে প্রথমে রামুতে, ঈদগরে, তার পর মাতামুহুরী উপত্যকায় এবং সবশেষে ১৮০৪ সালে বর্তমান বান্দরবান শহরে বসতিস্থাপন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন (R. H. S. Hutchinson : 1909 দ্রঃ)।

ইতিমধ্যে ১৭৮৪ সালে বর্মীরাজা ভোদফ্রা (বোদপায়া) এর প্রেরিত বর্মী সেনাবাহিনী স্বাধীন আরকান রাজ্য দখল করে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। ঐ সময় আরকান থেকে হাজার হাজার শরনার্থী এদিকে কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালীতে পালিয়ে আসে এবং এই সকল অঞ্চলগুলিতে স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

প্রশাসনিক কাঠামো ঃ পূর্বে বোমাং রাজারা তাদের অধস্তন ধামাই, রোয়াজা ইত্যাদি পদাধিকারী কর্মচারীদের দিয়ে প্রজাদের শাসন করতেন। এ বিষয়ে Joint Reply of Three Chiefs of Chittagong Hill Tracts against (J.P.) Mill's Report (1929, P.2) তে নিম্নলিখিত লাইনগুলি পাওয়া যায়, "The

Bohmoung's people formed a great powerful clan and subdivided into 12 main groups.... Each group was under Rowaza, or Dhamai, or Fansee, or Kaludak appointed by Bohmong." এখানে উল্লেখ্য যে, মারমারা গ্রামের প্রধানকে রোয়াঝা বলে, তাদের ভাষায় গ্রামকে 'রোয়া' বলা হয়।

দল ঃ মারমা সমাজে বেশ কয়েকটি দল রয়েছে। এ বিষয়ে T.H. Lewin তাঁর লিখিত The hill tracts of Chittagong and the dwellers therein (Calcutta 1869) বইটিতে নিম্নলিখিত দলগুলির নাম লিপিবদ্ধ করেছেন–

১. Rigray-tsa, ২. Palain-tsa, ৩. Kwikdyn-tsa, ৪. Suroong-tsa, ৫. Phrangroa-tsa, ৬. Kywkpian-tsa, ৭. Chereyng-tsa, ৮. Maro-tsa, ৯. Sabok-tsa, ১০. Taing-tchyt(?) ১১. Krong-Khyoung-tsa, ১২. Kyowkma-tsa, ১৩. Mahhaing-tsa.

ধর্ম ও ভাষা ঃ মারমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তারা নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন বৌদ্ধ অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করে থাকে। তাদের ভাষায় বৌদ্ধমন্দিরকে 'ক্যাং' এবং চৈত্যগুলিকে 'জাদি' বলে। মারমা ভাষা বর্মীদলের অর্ন্তভূক্ত। তারা দৈনন্দিন জীবনে বহু কাজে এখনও বর্মী বর্ণমালা ব্যবহার করে।

উত্তরাধিকার ও নারীর মর্যাদা ঃ মারমা সমাজে পুরুষ ও নারী উভয়েরই পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার রয়েছে। তাদের সমাজে নারীদের যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। তারা স্বাধীন ভাবেই বাড়ীতে ও ক্ষেতে কাজ করে। অনেকে ছোটখাট ব্যবসাবানিজ্যও করে থাকে। মারমা মেয়েদের কর্তৃক কোমরতাঁতে তৈরীকৃত লুঙ্গি ও অন্যান্য পোশাকগুলি দেখতে বেশ চমৎকার। তারা কেউ কেউ এগুলি বিক্রিও করে থাকে।

গ্রাম ও বাসগৃহ ঃ মারমারা নদী তীরে বাস করে। তাদের গ্রামগুলিকে সাধারণতঃ নদীতীরে সমতল ভূমির উপর দেখা যায়। পূর্বে প্রায় লোকই খুটির উপর তৈরী মাচাংঘরে বাস করতো। এগুলি সাধারণত; মাটির থেকে ৫/৬ ফুট উঁচু হয়। বাঁশ নির্মিত মাচাং এর উপর একদিকে শোবার ঘর থাকে। এর সাথে সংযুক্ত করে 'ফ্যাক' (রান্নাঘর), তার পাশে 'রাজাং' (জলরাখার ঘর) এবং যাংজাং (লাকড়ীঘর) রাখা হয় (ক্য শৈ প্রু ঃ ১৯৮১ ইং)। এ

ছাড়া আলাদা আলাদা ভাবে মংদুরুং (ঢেঁকিশালা) এবং মইং জাং (প্রসূতী গৃহ) ও তৈরী করা হয়।

মারমাদের প্রায় গ্রামেই 'ক্যাং' (বৌদ্ধমন্দির) ও পথিকদের জন্য বিশ্রামগার 'চরাইক' থাকে। তাতে তৃষ্ণার্ত পথিকদের জলপানের জন্য জল রাখা হয়। এতে জলদানকারীর পূন্য হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

শিশুর নামকরণ ঃ মারমা সমাজে শিশুদের নামকরণের ব্যাপারে কতগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নবজাত শিশুটি যদি দম্পতির প্রথম সন্তান (ছেলে হোক বা মেয়ে হোক) হয়ে থাকে তবে তার নামকরণের সময় তার নামের শুরুতে 'উ' যুক্ত হয়। যেমন উ-বা-মং, উ-সাঙ্গ্য-মা ইত্যাদি। আবার নবজাত শিশুটি যদি দম্পতির শেষ সন্তান হয়ে থাকে তবে অনেক সময় তার নামের শেষে 'থুই' থাকে। যেমন মং-সা-থুই, অং-সা-থুই ইত্যাদি। এ ব্যাপারে অনেকে বৌদ্ধভিক্ষুদের কাছে গিয়েও শিশুর জন্য নাম নিয়ে আসেন।

বিবাহ ঃ মারমা পরিবারগুলিতে ছেলে বিবাহযোগ্য হলে বরের পিতামাতা বা অভিভাবকেরা পছন্দমত পাত্রী দেখতে যান। তারা পাত্রীর পিতামাতা বা অভিভাবকদের জন্য সাথে নানা সামগ্রী নিয়ে যান। উভয় পক্ষ রাজী হলে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যায়। বিয়ের সময় বর ও কনেকে পাশাপাশি বসানো হয়। বরের ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলের সাথে কনের বাম হাতের কড়ে আঙ্গুল দু'টি যুক্ত করে দিয়ে তাদের বিয়ে সম্পন্ন করা হয়। রীতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক ভাবে বর ও কনেকে একই থালা থেকে ভাত খেতে হয়। এরপর উপরিস্থ অত্মীয়স্বজনেরা একটি পাত্র থেকে বিনিধানের খৈ নিয়ে সেগুলি তাদের মাথায় দিয়ে তাদেরকে আশীবাদ করেন।

মৃত্যু ঃ মারমা সমাজে কোন ব্যাক্তির মৃত্যু হলে প্রথমে আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়া হয়। যেদিন মৃতকে দাহ করা হয় সেদিন প্রথমে মৃতকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয়। এরপর আমন্ত্রিত বৌদ্ধভিক্ষুরা মৃতের আত্মার সদগতি কামনা করে ধর্মীয় সূত্র পাঠ করেন। মৃতের আত্মীয়স্বজনেরা মৃতের সদগতি কামনা করে তাদের সাধ্যমত বিভিন্ন সামগ্রী ও অর্থ দান করে। এরপর মৃতকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। ও চিতার উপর রেখে দাহ করা হয়। পরে চিতার চারপাশে সাদা রঙের একটি লম্বা কাপড় 'তাংগোন' উড়িয়ে দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা

দুইজন ত্রিপুরা তরুনী

ত্রিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগুলির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে তৃতীয় স্থানের অধিকারী হলো ত্রিপুরা (Tripura) উপজাতি অনেকে তাদের নাম টিপরা, তিপারা ইত্যাদি লিখে থাকেন। চাকমারা তাদেরকে তিবিরা, লুসেইরা 'তুইকুক্' এবং মারমারা 'ম্রুং' বলে। পাবর্ত্য চট্টগ্রামে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় উসাই (Usui) নামে ত্রিপুরাদের একটি শাখা রয়েছে। ত্রিপুরারা বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড পাহাড়ে বাস করে। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় এখানে ত্রিপুরা পরিবারগুলির সংখ্যা ৯৯৭৭টি এবং তাদের অন্যতম শাখা উসাই পরিবারগুলির সংখ্যা ৭৩৬ টি ছিল। উক্ত আদমশুমারীর সময় প্রতি পরিবারে লোকসংখ্যা গড়ে ৫.৭৫ জন ধরা হয়। এই থেকে ঐ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরাদের লোক সংখ্যা আনুমানিক ৫৭,৩৬৮ জন এবং উসাইদের লোকসংখ্যা আনুমানিক ৪,২৩২ জনের মত ছিল বলে জানাযায়।

ইতিহাসঃ ত্রিপুরাদের আদিনিবাস ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। সেখান থেকে অতীতে তাদের লোকজন পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও রত্নমানিক্যের সময় (১৪৬৩-১৪৬৭ খৃঃ) ত্রিপুরাদের রিয়াং দলের লোকেরা মাইয়ুনী উপত্যকায় বসবাস করছিল বলে ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থ 'শ্রীরাজমালা' সূত্রে জানা যায়। এ বিষয়ে Mr. Omesh Saigal তাঁর লিখিত TRIPURA (1978, P. 94) বইটিতে রিয়াংদের সম্পর্কে লেখেছেন, "There is a story that in the Old days the Reangs lived in the Maiyanithlang area of Lushai Hills, bordering on and stretching into Arakan of Burma .....due to heavy demands made on them, they migrated to the Karnaphuli valley of Chittagong Hill Tracts during the reign

of Ratna Manikya." এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, Joa de Barros ষোড়শ শতাব্দীতে Descripcao do Riino de Bengalla নামক যে মানচিত্র আঁকেন তাতে ঐ সময় কর্নফুলী নদীর উত্তর ভূখন্ড Reino de Tipora অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে ছিল বলে দেখা যায়। এখানকার রিয়াংরা রাজা গোবিন্দমানিক্যের রাজত্বকালের (১৬৬০–১৬৬৬ খৃ) প্রথম দিকে বিদ্রোহ করায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন বলে Mr. Omesh Saigal (১৯৭৮) নিম্নলিখিত লাইনগুলিতে লেখেছেন," Many expeditions sent later similarly failed to return. The raja got worried and sent seven of his most faithful warriors to unraval the mystery. These people were not only brave but were also very wise and clever. They were accustomed by Kachak minister as they entered the Reang country." উল্লেখ্য ১৬৬১ সালে ত্রিপুরার সিংহাসন নিয়ে ছত্রমানিক্যের সাথে বিরোধ দেখা দিলে গোবিন্দ মানিক্য নিজেই এখানে দীঘিনালায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময় দীঘিনালায় বড় দীঘিটি খনন করা হয়েছিল।

বান্দরবানে বসবাসকারী ত্রিপুরাদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে Mr. R. H. S. Hutchinson লেখেছেন, : Tradition says that the Riangs formerly resided in the hills to the south of the Matamuri river, under the leadership of two brothers by name Kilay and Manglay, who were Karbaris or managers on behalf of the Tippera Raja Udaigiri.:

উপরোক্ত ত্রিপুরার রাজা Udaigiri-এর প্রকৃত নাম উদয় মানিক্য (১৫৬৭–১৫৭২ খৃঃ)। তিনি জাতিতে রাজপুত ছিলেন এবং ত্রিপুরার প্রাচীন রাঙ্গামাটিয়া শহরের নাম বদলে উদয়পুর রেখেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর রাজত্বকালে মাতামুহুরী উপত্যকায় ত্রিপুরাদের ফাতং, হারবাং ইত্যাদি দফার লোকদের বসতি ছিল। পরবর্তীকালে ত্রিপুরার রাজারা' দুর্বল হয়ে পড়লে ত্রিপুরাদের অধিকাংশ লোকজন এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশের চেয়ে উত্তরাংশেই অধিক হারে থেকে যায়। উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরাদের মধ্যে এখনও বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইতং ও ফাতং মৌজার এবং কক্সবাজার জেলার হারবাং স্থানটির নামানুসারে তিনটি দফা (দল)–এর নাম রয়েছে।

দল উপদলঃ

ত্রিপুরাদের মধ্যে বহু দল আছে। তবে এ কথা সাধারণ ভাবে প্রচলিত যে, ত্রিপুরা সমাজে ৩৬টি 'দফা' (দল) আছে। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের বর্তমান পরিচালক মিঃ সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা তাঁর লিখিত 'ত্রিপুরা পূজা পার্বণ' বইটিতে ত্রিপুরাদের নিম্নলিখিত দফাগুলির নাম লিপিবদ্ধ করেছেন–

১. নাইতং, ২. ফাতুং, ৩. দেঁইদক, ৪. গাবিং (কাপিং), ৫. খালি, ৬. হারভাং, ৭. রিয়াং, ৮. উসুই, ৯. টংবাই, ১০. মংবাই, ১১. কেওয়া, ১২. কেমা, ১৩. আসলং ১৪. আনক, ১৫. বেরী, ১৬. দাসপা, ১৭. রুক্কিনী, ১৮. জামাতিয়া, ১৯. নোয়াতিয়া, ২০. রাংখল, ২১. হাপাং, ২২. হালাম, ২৩. কলই, ২৪. মলসম, ২৫. গর্জং, ২৬. গাইগ্রা, ২৭. মুইচিং, ২৮. খাকুলু, ২৯. গুরপাই, ৩০. চরই, ৩১. কৈরিং ৩২. মুকচাক। এসকল দফাগুলি কোন কোনটি আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। যেমন মাইপালা দফার উপদলগুলি হলো মুরুংচুকুং, মাইমিলাক, দবদবি, কেলাবাড়িয়া, সিকাম ইত্যাদি। এদের নামকরণ সম্পর্কে কিছু তথা নিম্নে দেওয়া গেলঃ–

১. **মাইপালাঃ** এই বংশের জনৈক পূর্ব–পুরুষ নাকি রাজার বিয়েতে ভাত তরকারী মেহমানদের বিতরণ করেছিলো। ত্রিপুরা ভাষায় 'মাই' অর্থ ভাত।

২. **লিগাঃ** ঐ বিয়েতে ওঝাগিরি করে লিগা–ওছাই অর্থাৎ লিগা–নামক ওঝা। তার বংশধরেরাই হলো লিগাগোষ্ঠীর লোক

৩. **কোয়াইতিয়াঃ** এ বিয়েতে মেহমানদেরকে পানসুপারি বিতরণ যিনি করেন, তিনি হলেন কোয়াইতিয়া। ত্রিপুরা ভাষায় 'কোয়াই' অর্থ সুপারী।

৪. **সেংক্রোঃ** এই বংশের পূর্ব পুরুষ তরোয়াল (সেংক্রা) ওয়ালা ছিলেন। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি হলো–

৫. **কাপিং** ৬. **নাইতং** ৭. **মাহিং** এবং ৮. **দৈচিং**–উল্লেখিত গোষ্ঠীগুলো আবার কতগুলো উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। যথা–মাইপালা গোষ্ঠীর উপগোষ্ঠি সমূহ–

১. **মুরুং চুকুং (মাইপালা:** এই বংশের পূর্ব পুরুষ ডাকিনী বিদ্যায় ওস্তাদ ছিল। মারমা ভাষায় মুং অর্থ ত্রিপুরা এবং চুকুং অর্থ ডাকিনী।

২. **মাইমিলাক (মাইপালা):** এই বংশের পূর্ব-পুরুষের কথা বলার ভঙ্গী নাকি বিনি ধানের (ভাতের) আঠার মতো জড়তাগ্রস্ত ছিলো।

৩. **দবদবি (মাইপালা):** এই বংশের পূর্ব পুরুষেরা ধন এবং প্রতিপত্তিশালী ছিলো। চাকমা ভাষায় 'দবদবি' অর্থ প্রতিপত্তি বুঝায়।

৪. **কেলাবাড়িয়া (মাইপালা):** এই বংশের পূর্ব-পুরুষের বিরাট একটা কলা বাগান ছিলো।

৫. **সিকাম (মাইপালা):** ত্রিপুরারা কুকিচীন দলের লোকদেরকে সিকাম বলে। একবার এ সমস্ত দুর্ধর্ষ লোকরো একটি ত্রিপুরা গ্রাম আক্রমণ করে যাওয়ার সময় একটি ছেলে ধরে নিয়ে যায়। পরে ছেলেটি বড় হলে তারা তাকে স্বস্থানে ফেরত পাঠায়। ওই ছেলের বংশের লোকেরাই হলো সিকাম (মাইপালা)।

এখানে উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরাদের অন্যান্য গোত্রগুলোও এভাবে বিভিন্ন উপগোত্র বা উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। সম্ভবত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কর্ম এবং পেশাকে কেন্দ্র করেই ত্রিপুরাদের উপগোত্রগুলোর নামকরণ হয়েছে।

রিয়াংদের সামাজিক কাঠামো: এ সম্পর্কে Mr. Omesh Saigal লেখেছেন, The political system of the Reangs was headed by the Rai, the supreme chief. He was assisted by his Prime Minister, Kachak. It is interesting to note that the title of the fabled ruler of the Reangs was given to the Prime Minister of their de-facto ruler. Each one of these functionaries was assisted by a number of sardars. The Rai was assisted by Chapiakha, his sucessor, and Chapia, the Chapiakha's successor, the three of them forming a sort of Supreme Council.

এখানকার ত্রিপুরাদের গ্রামে রোয়াজা, ধাবেং ও মুরচুই উপাধি গ্রহণকারী ব্যক্তিরা ত্রিপুরাদের গ্রামবাসীদেরকে নেতৃত্বে দিয়ে থাকেন, এ বিষয়ে মিঃ মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরার কাছে জানতে পেরেছি যে, গ্রামবাসীরাই উপযুক্ততা দেখে এ সব ব্যক্তিদেরকে নির্বাচিত করেন। নির্দিষ্ট দিনে এ বিষযে আনুষ্ঠানিক ভাবে সভা ডাকা হয়। উক্ত সভায় একটি অনুষ্ঠানে ত্রিপুরাদের ১৪ জন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়। তৎপরে প্রথমে একটি নির্দিষ্ট আসনে একজনকে রোয়াজা পদে, তার ডানে ও বামে যথাক্রমে ধাবেং ও মুরচুই পদে অপর দু'জন ব্যক্তিকে বসিয়ে তাদেরকে মাল্যভূষিত করে আনুষ্ঠানিক ভাবে বরণ করে নেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয়ের ১০/১৬ ভাগ রোয়াজা পদপ্রার্থীকে ও ৬/১৬ ভাগ ধাবেং ও মুরচুই পদপ্রার্থীকে বহন করতে হয়।

ধর্ম ও ত্রিপুরাদের ১৪ দেব–দেবীঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরারা হিন্দুধর্মাবলম্বী তবে তাদের অন্যতম শাখা উসাইরা বর্তমানে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরারা ১৪ জন দেবদেবীর পূজা করে থাকে বলে সাধারণ ভাবে বলা হয়। এ বিষয়ে মিঃ সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরার লিখিত 'ত্রিপুরা পূজাপার্বন' (পৃঃ ১০) বইটিতে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায় ১. মাতাইকতর (মহাদেব বা হর), ২. লাম, ৩. প্রা, ৪. সংগ্রংমা (হিমালয়/পার্বতী?), ৫. তুইমা (গঙ্গা), ৬. মাইলুংমা (লক্ষ্মী), ৭. লুংমা–খুইজংমা (কার্পাসদেবী), ৮. বুড়াসা, ৯. ঝানিরাও (বুড়াসার সন্তান), ১০. বুডিরক (সাতবোন), ১২. কারায়া, ১২. গরয়া ইত্যাদি।

এ সকল দেবদেবীদেরকে বিভিন্ন পূজার সময় 'অচাই' নামক ত্রিপুরা ওঝারা নানা পশুপাখি বলি দেয়। এ সকল বলির উপদানের মধ্যে শূকর, পাঁঠা, মোরগ, মুরগী, ডিম ইত্যাদি থাকে। ত্রিপুরারা যদিও কুকুরের মাংস খায়না তথাপি তারা কোন কোন অপদেবতাকে কুকুর পর্যন্ত বলি দেয়। কুকুর বলি দেওয়ার সময় কুকুরটাকে মুগুর দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয় (সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা দ্রঃ)। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ত্রিপুরা সমাজে একজন ধর্ম–সংস্কারক ও সাধু, রত্নমনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নীলকমল (নোয়াতিয়া (Nalini Ranjan Roy Choudhury: Tripura through the ages)

গোত্র পরিচয়ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে একমাত্র ত্রিপুরা সমাজে পিতা ও মাতা উভয় ধারায় দ্বিধারায় (bilineal) বংশ গণনার প্রথা চালু রয়েছে। মিঃ মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা আমাকে জানান যে, ত্রিপুরাদের দেনদাক, ফাতং, খালি ইত্যাদি বেশ কয়েকটি 'দফায় (দলে) এই দ্বিধারায় বংশ গণনা প্রথা চালু রয়েছে। এতে একজন পুত্রসন্তান তার পিতার দফা (দল) ও গোত্রের অধিকারী হয়। আবার একই পিতার ঔরষজাত কন্যা তার মায়ের দফা ও গোত্রের পরিচয় লাভ করে। আবার ত্রিপুরাদের আসলং দফার মেয়েরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে নাকি সব সময় মাতৃধারায় (matrilineal) দফা ও বংশ গণনা করে।

ত্রিপুরা ভাষাঃ ত্রিপুরাদের নিজস্ব ভাষা আছে। একে 'কক্‌বরোক' বলা হয়। ত্রিপুরাদের ভাষা বৃহত্তর বোডো (Bodo) দলের অন্তর্ভুক্ত। তাদের ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে Dr. Suniti Kumar Chatterji তাঁর লিখিত Kirata Jana Krti (2nd ed. Calcutta 1974) বইটিতে লেখেছেন, But nearly 303,030 people in the state (Tripura) have still kept up their old Bodo language Tipra or Mrung."

বিষু উৎসব ও সঙ্গীতনৃত্যঃ ত্রিপুরারা বাংলা বর্ষের শেষ দুইদিন ও নববর্ষের প্রথম দিনে বিষু উৎসব উদযাপন করে। 'পূব্‌-ই-রাবাইনি সাল' (চট্টগ্রাম ১৯৮১ ইং) বইয়ের সম্পাদক মিঃ বরেন ত্রিপুরা তাঁর লিখিত 'ত্রিপুরা জাতি পরিচিতি' প্রবন্ধে এ বিষয়ে লেখেছেন যে, বাংলা বর্ষের শেষ দিনটিতে ত্রিপুরারা 'বিষুমা', তার আগের দিন টিকে 'হারি বিষু' ও নববর্ষকে 'বিষুকাতালনি' বলে। বিষুমা দিনে ত্রিপুরাদের বাড়ীতে অতিথিদেরকে মিষ্টি, পিঠা, পাচন ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। তারা নববর্ষের সময় একে অন্যকে ভোজে আমন্ত্রণ জানায়। বিষুর সময় ত্রিপুরা শিল্পীরা গ্রামে 'গরয়া' নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে থাকে। ত্রিপুরারা সঙ্গীত ও নৃত্যের বেশ অনুরাগী। তাদের পরিবেশিত বোতল নৃত্য দেশ বিদেশে দর্শকদের কাছে পরিবেশিত হয়ে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। এ ছাড়া ত্রিপুরাদের অন্যান্য নৃত্যের মধ্যে কেরপূজানৃত্যও বেশ চিত্তাকর্ষক।

জন্ম ও নামকরণঃ ত্রিপুরা পরিবারে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুটিকে উষ্ণজলে স্নান করিয়ে তার মুখে মধু দেওয়া হয়। ডলু বাঁশের ধারালো টুকরা দিয়ে

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরী

শিশুটির নাভীটি কেটে সাদা সূতা দিয়ে বাঁধা হয় ও তাড়াতাড়ি শুকানোর জন্য নাভীর মুখে সিঁদুর বা কাপড় পোড়া ছাই লাগিয়ে দেওয়া হয়। শিশুটির নাভীটি শুকিয়ে গেলে ওঝা ডেকে বাড়ীর লোকেরা 'ঘিলা-কজই' ও সোনা-রূপার পানি শিরে ছিটিয়ে পবিত্র হয়। এর আগ পর্যন্ত প্রসূতীকে রান্নাবান্না করার তৈজসপত্র ও অন্যান্য উপকরণাদি স্পর্শ করতে দেওয়া হয়না। অতপর একদিন ধাইকে ডেকে তার হাতে এক বোতল মদ, একখানা নতুন কাপড় ও নগদ টাকা (পাঁচ টাকা) দিয়ে শিশুটির মা ধাইয়ের কাছ থেকে তার ছেলেকে কিনে নেয়। ধাই ঐ সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে শিশুটিকে তার মায়ের কোলে তুলে দেয়।

শিশুর নামকরণের সময় অনেকে ৫/৭টি মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রত্যেক প্রদীপের বরাবরে এক একটি নাম শিশুর জন্য প্রস্তাব করা হয়। যে প্রদীপটি বেশী জ্বলে, ঐটির সাথে প্রস্তাবিত নামটি শিশুটিকে রেখে দেওয়া হয়। এতে শিশুটির মঙ্গল হবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

বিবাহঃ ত্রিপুরা সমাজে দফা ও গোত্র ভেদে নানা ধরণের বিয়ের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। নিম্নে নাইতং দফার মাইপালা গোত্রের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বর্ণনা করা গেল। এ বিষয়ে গিরিনির্ঝর (২য় সংখ্যা, ১৯৮২ ইং) নামক পত্রিকায় মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা তাঁর লিখিত 'ত্রিপুরা বিবাহরীতি' প্রবন্ধে লেখেছেন যে, বরপক্ষকে কনের বাড়ীতে যাওয়ার সময় অবশ্যই সঙ্গে করে দুই বোতল মদ নিয়ে যেতে হয়। এগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে কনের পিতা বা অভিভাবকের হাতে অর্পণ করা হয় এবং তিনি তা নিলে ঐ বিয়েতে তাঁর চূড়ান্ত সম্মতি প্রকাশ পায়। এরপর গ্রামের মুরুব্বী ও কনের আত্মীয় স্বজনদের উপস্থিতিতে কনের জন্য অলংকারপত্র, গহনা, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি দাবী করা হয়। বরপক্ষ বিয়েতে রাজী হলে বিয়ের দিনক্ষণ ধার্য করা হয়। বিয়ের দিন বরযাত্রীরা কনের বাড়ীতে গিয়ে নতুন অলংকারপত্র ও পোশাক পরিচ্ছদ দিয়ে কনেকে সাজায়। তারা তৎপূর্বে কনের পিতা বা অভিভাবকের হাতে মদের বোতল দিয়ে কুশল বিনিময় করে। ঐ সময় তারা কনেপক্ষের কোন দাবী থাকলে সেগুলিও পূরণ করে। তারা কনের মাকে অথবা কনে মাতৃহীনা হলে তার পালনকর্ত্রীকে এক জোড়া পরনের কাপড় (রিনাই ও রিমা) এবং অর্থ (৫/১০ টাকা) গছিয়ে নমস্কার পূর্বক বলে, "আপনি অনেক কষ্টে আপনার কন্যাকে ছোট থেকে বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছেন, আমরা আপনাকে দুধের জন্য এই টাকাটা দিচ্ছি। আপনি

আপনার কন্যার লালন পালনের দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে এবার সহজ চিত্তে তাকে আমাদের ঘরে নেওয়ার অনুমতি দিন। "তখন তার মা (বা লালনপালনকারিনী) তাকে আশীর্বাদ করে বরের বাড়ীতে নেওয়ার অনুমতি দেয় (মহেন্দ্রলাল ত্রিপরা; ১৯৮২ ইং) এরপর কনেকে নিয়ে বরযাত্রীরা রওনা হয় তারা বরের বাড়ীতে পৌছলে বরের কনিষ্ঠ কোন ভাই বা বোন এসে বর ও কনেকে একটি পিঁড়িতে তুলে পা ধুয়ে দেয়।

রীতি অনুযায়ী প্রথমে বর কনে ও তৎপরে অন্যান্যরা বাড়ীতে ওঠে। বিয়ের অনুষ্ঠানে বর ও কনেকে পাশাপাশি বসানো হয়। একজন অচাই (ওঝা) অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের শুরুতে বর ও কনেকে অচাইয়ের নির্দেশমত বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের বর, কনে ও তাদের সঙ্গী ৪ জন বালক বালিকার জন্য খাবারের থালা সাজিয়ে রাখা হয়। এ গুলি তারা অনুষ্ঠানের পরে খায়। বর ও কনের সামনে এক জোড়া কলাপাতায় দু'মুঠো ভাত, দু'টি মোরগ মুরগীর রান এবং দু'টি চোঙ্গায় মদ রাখা হয়।একটি থালায় বীজযুক্ত তুলা সহ চাউল আনা হয়। একটি সাদা কাপড় দিয়ে বর ও কনের কোমরগুলির চারিদিকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। অচাই (ওঝা) একটি পানিপূর্ণ ঘটি হাতে নিয়েই চাউল ও তুলার উপর পানি ছিটায় এবং এক টুকুরো তুলায় চাউল নিয়ে 'সুকুন্দ্রাই-বুকুন্দ্রাই' দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সেগুলির উপর থুতু দিয়ে (প্রকৃতপক্ষে থুঃ থুঃ শব্দ করে) ঐগুলি বর ও কনের মাথায় তুলে দিয়ে তাদেরকে আশীর্বাদপূর্বক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে। এরপর উপস্থিত উপরিস্থ আত্মীয়স্বজনেরা বর ও কনেকে একইভাবে তুলা ও চাউল শিরে দিয়ে আশীবাদ করেন। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে খানাপিনা দিয়ে ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

মৃত্যুঃ ত্রিপুরা সমাজে কোন লোকের মৃত্যুহলে ত্রিপুরারা মরদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে চিতার উপর রেখে যথারীতি দাহ করে। মৃত যদি দাঁত না ওঠা কোন শিশু হয় তবে সেক্ষেত্রে অনেকে মৃত শিশুকে দোলনা বা খাঁচায় রেখে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গাছের আগায় ঝুলিয়ে দেয়। ত্রিপুরাদের Death-rites সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মিঃ বরেন ত্রিপুরা তাঁর লিখিত 'ত্রিপুরা জাতি পরিচিতি' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেছেন, "শ্মশানে মৃতের শ্রাদ্ধপর্ব শেষান্তে শ্মশানে অস্থায়ী ভাবে যে মাচান-ঘর তৈরী করা হয় সেই মাচান-ঘরের চারিদিকে উপস্থিত মেয়ে পুরুষ সকলে ঘুরে ঘুরে বাদ্য সহকারে নাচতে

থাকে আর সুর করে বলতে থাকে–কে মরেনা–কে মরেনা সকলেই মরবে –কেউ অমর নয়। যে মরেছে–সে বেঁচেছে –আনন্দ কর–আনন্দ কর এই রূপে তারা মৃতের আত্মাকে বিদায় জানায় কারণ তাদের বিশ্বাস যদি তাতে কান্নাকাটি করে তবে মৃতের অমর আত্মা সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করে উর্ধ্ব মার্গে চলে যেতে চায়না। কাজেই যদিও সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কিন্তু শেষ বিদায়কালে তারা হাসিখুশীতে নাচের মাধ্যমে মৃতের আত্মাকে বিদায় দেয়।

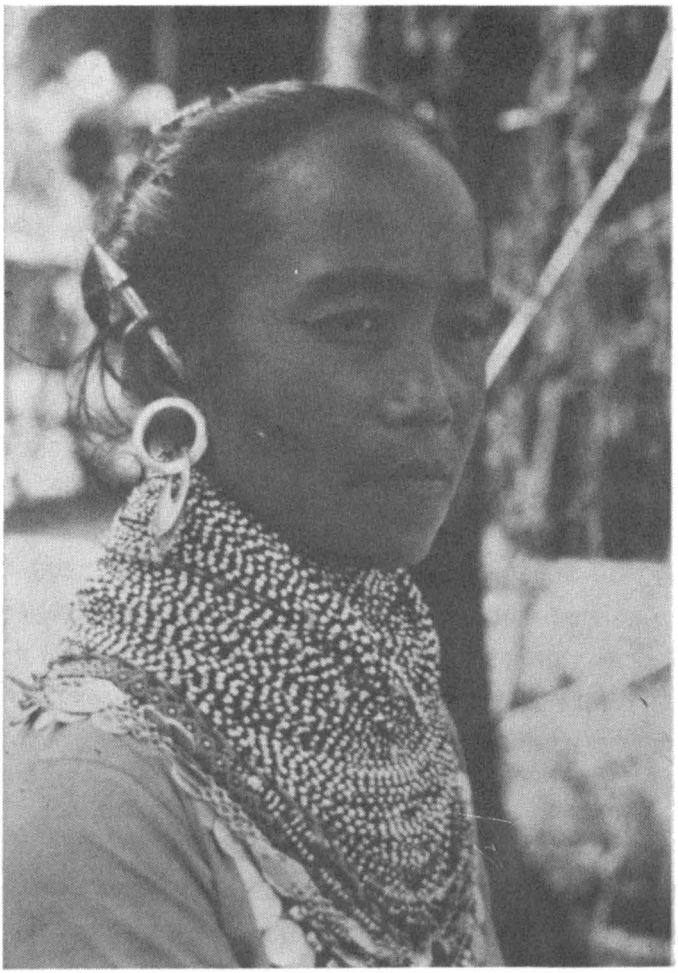

ত্রিপুরা মহিলা

ম্রো

জুমে গমনরত ম্রো তরুনী

ম্রো

পার্বত্য চট্টগ্রামের যে ক'টি উপজাতির মধ্যে তাদের আদি ও অকৃত্রিম সংস্কৃতির বেশ কিছুটা এখনও টিকে আছে তাদের মধ্যে ম্রোদের নাম অন্যতম। ম্রোরা একটি প্রাচীন উপজাতি। স্মরণাতীত কাল থেকে তারা বার্মার আরাকান রাজ্যে বসবাস করে আসছে। এখনও উত্তর আরাকানের কোলাদন নদীর উপনদী মি (Mi) নদীর তীরে ম্রো (Mro) দের বসতি রয়েছে। মূলতঃ উত্তর আরাকান থেকেই ম্রোরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটির অনতীদূরে ভার্জ্যাতলীতে ম্রোদের একটি গ্রাম রয়েছে। তবে তাদের অধিকাংশ লোকজন বান্দরবান পার্বত্য জেলায় লামা, আলিকদম, থানছি ইত্যাদি এলাকাগুলিতে বাস করে।

বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারী রিপোর্টে ঐ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ম্রোদের পরিবারগুলোর সংখ্যা ২২৯৫ টি ছিল বলে জানা যায়। উক্ত আদমশুমারীতে প্রতি পরিবারে সদস্য সংখ্যা গড়ে ৫.৭৫ ধরা হয়েছে। এ থেকে ঐ সময় ম্রোদের জন সংখ্যা এখানে আনুমানিক ১১,১৯৬ জন ছিল বলে জানা যায়। বস্তুতঃ জনসংখ্যার দিক থেকে ম্রোরা বান্দরবান পার্বত্য জেলায় দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ট উপজাতি। সেখানে মারমাদের পরেই তাদের স্থান। Mr. G. E. R. Grant Brown কর্তৃক Nor thern Arakan District-এর উপর লেখা Burma Gazetteer থেকে জানা যায় যে ১৯৩১ সালে উত্তর আরাকান জেলায় ম্রোদের জনসংখ্যা ২৫০০ জনের মত ছিল। বর্তমানে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে কত হয়েছে তা' জানা নেই, তবে তাদের বহু লোকজন আরাকানের দক্ষিণাংশে আকিয়াব জেলায়ও রয়েছে। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ডজনের উপর ম্রোদের গোত্র থাকলেও আরাকানে কিন্তু তাদের শতাধিক গোত্র রয়েছে বলে সেখানকার পুস্তকগুলো থেকে জানা যায়।

নাম ও বৈশিষ্ট্যঃ 'ম্রো' (MRO) শব্দের অর্থ মানুষ। রেকর্ডপত্রে অনেকে তাদের নামে বানান মু (MRU) হিসেবেও লেখে থাকেন। কেউ কেউ তাদের সমাজে 'মারুসা" হিসেবেও নিজেদেরকে পরিচয় দেয়। তবে এখানকার অন্যান্য লোকদের

অনেকের কাছেই তারা 'মুরং' হিসেবে পরিচিত। ম্রোদের পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুল রেখে ঝুটি বাঁধে। তারা দাঁতে রঙ লাগায়। মেয়েরা অনেকে বক্ষে কোন বক্ষবন্ধনী বা ব্লাউজ ব্যবহার করেনা; তারা নিম্নাংগে ঘননীল রঙের স্বল্প প্রস্থের এক জাতীয় স্কার্ট পরে। এ কারণে সহজেই যে কোন ম্রো পুরুষ বা রমণীকে এখানকার অন্যান্য উপজাতীয় পুরুষ বা রমণীদের থেকে আলাদা ভাবে চিনা যায়।

ম্রো–কিংবদন্তীঃ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরাকানের প্রাচীন উপজাতিদের মধ্যে ম্রোরা অন্যতম। আরাকানের প্রাচীন রাজধানীর নাম ধিন্যাওয়াদী (ধন্যবতী)। এই ধিন্যাওয়াদী শহরটি প্রাচীন কালে আরাকানের কিংবদন্তী খ্যাত বিখ্যাত রাজা মারায়ো (Marayo) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কিংবদন্তী অনুসারে সুদূর অতীতে একদিন এক ম্রো সর্দার কোলাদন নদীর উজানে শিকারে গিয়ে বনে একটি শিশু পান। এক বন্য হরিনী শিশুটিকে সেখানে নিয়ে এসেছিল। ম্রো–সর্দার শিশুটিকে নিয়ে গ্রামে ফিরেন এবং শিশুটিকে লালন পালন করেন। এই শিশুটিই বড় হয়ে আরাকানের বিখ্যাত রাজা মারায়ো হয়েছিলেন এবং আরাকানে প্রাচীন রাজধানী ধান্যাওয়াদী শহরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ধান্যাওয়াদী শহরটির ধ্বংশাবশেষ এখনও আরাকানের দেখতে পাওয়া যায়।

উ পান্ডিতা লিখিত 'ধান্যাওয়াদী রাজাওয়াং সাইক্যম' (১৯১০ ইং) বইটিতে উক্ত ম্রো সর্দারের নাম অংলাহ্ মতান্তরে সাংগ্রি–অংহ্রা ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ম্রো সর্দার মারায়োর সাথে তার মেয়ে 'ভি' কে বিয়ে দিয়ে তাদের রাজা ও রানী করেন। ম্রোরা খুব উচু সাতটি পাহাড়ের উপর মারায়োর জন্য সাতটি বাড়ী তৈরি করে দেয়। এ সময় আরাকানের প্রাচীন রাজধানী ওয়েথালী (বৈশালী) শহরে রাক্ষসদের খুব উৎপাত চলছিল। মারায়ো সসৈন্যে ওয়েথালী শহরে গিয়ে রাক্ষসদের পরাজিত ও ধ্বংশ করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজত্ব করেন। তিনি ওয়েথালীর পুর্বের ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজবংশের রাজকন্যা রোজিতা মালাকে বিয়ে করেন ও রোজিতমালার মা (বিধবা রাণী) কে শাশুড়ীর মর্যাদা দেন। কিংবদন্তী অনুসারে মারায়ো ১৮ বছর বয়সে রাজা হয়ে ৬২ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করে ৮০ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর ছেলে মারাজেতু তাঁর মৃত্যুর পরে আরাকানের রাজা হযেছিলেন। মারায়ো ওয়েথালী শহর থেকে নতুন একটি স্থানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করে এর নাম ধান্যাওয়াদী (ধন্যবতী) রাখেন। এককালে আরাকান ঐ নামেও পরিচিত হয়েছিল।

ম্রোদের ইতিহাসঃ আরাকানী ইতিহাস বইগুলিতে ম্রোদের সম্পর্কে প্রকৃত যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা হলো আরাকানের রাজা সুলতইং চন্দ্র ৯৫৩ সালে চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন। এর কয়েক বছর পরে ৯৫৭ সালে দক্ষিণ বার্মায় কোন এক অভিযান সমাপ্ত করার পর (সেন্দোয়ে থেকে ফেরার পথে নদীতে ডুবে?) মারা যান। এ খবর প্রধানমন্ত্রী রাণী চন্দ্রাদেবীকে জানালে তিনি রাজার মৃত্যুর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে সন্দেহ করতে থাকেন। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে রাণীর বিবাদ হয়। তখন প্রধানমন্ত্রী ভয়ে প্রথমে কাসাপা (কোলাদন) নদীর উজানে একস্থানে পালিয়ে যান এবং পরে সেখান থেকে অন্যত্র সরে পড়েন। ঐ সময় রাণী চন্দ্রাদেবী তিনমাসের গর্ভবতী ছিলেন। তাঁর গর্ভে রাজা সুলতইং চন্দ্রের এক সন্তান ছিল। এই অবস্থায় আরাকানের দুর্বলতার সুযোগে ম্রোদের নেতা আম্রাথু (Amrathu) আরাকানের সিংহাসন দখল করে রাজা হন। তিনি সুলতইং চন্দ্রের বিধবা স্ত্রী রানী চন্দ্রাদেবীকে বিয়ে করেন এবং তাঁর ভাই আম্রাকুকে যুবরাজ করেন, আর ভ্রাতুষপুত্র পেফ্রু (Pai-Phru) 'ম্রাউ' গ্রামের শাসন ভার দেন। আম্রাথু ৬ বছর রাজত্ব করার পর তাঁর ভাই আম্রাকুর সাথে রাণী চন্দ্রাদেবীর গোপন প্রেম রয়েছে বলে সন্দেহ করতে থাকেন। এরফলে তিনি আম্রাকুকে হত্যা করার জন্য এক অভিনব পরিকল্পনা করেন।

পরপর কয়েক রাত তিনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখার ভান করে গভীর রাতে চেঁচিয়ে উঠতে লাগলেন। এবিষয়ে রানী চন্দ্রাদেবী জিজ্ঞেস করলে তাঁর উত্তরে তিনি বলতে থাকেন, পূর্বে তাদের পূর্ব পুরুষেরা যে সকল দেবতাদেরকে পাহাড়ে পূজা করতো তারা এখন পূজা পাওয়ার জন্য স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিচ্ছে। সুতরাং তাঁকে তার ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র ও অন্যান্য ম্রোদের নিয়ে পাহাড়ে ওঠে জঙ্গলের ভিতর গিয়ে ঐ সব দেবতাদের উদ্দেশ্যে পুজা দিতে হবে। এরপর একদিন তিনি তাঁর ভাই আম্রাকু, ভ্রাতুষ্পুত্র পেফ্রু ও ম্রোদের নিয়ে ম্রো-পোশাকে সজ্জিত হয়ে দেবতাদেরকে পূজা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দূরের উচুঁ পাহাড়গুলির দিকে রওনা হলেন। দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়ার জন্য একটি সাদা মহিষ ও গরু নিয়ে যাওয়া হলো। যে পাহাড়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হবে সেদিকে সবার আগে রাজা আম্রাথু ও তাঁর ভাই আম্রাকু সাদামহিষটি নিয়ে অন্যদেরকে পিছনে ফেলে রওনা হয়েছিলেন। এ সময় একটি ছোট পাহাড়ী নদীতে পৌছলে সবার অগোচরে রাজা আম্রাথু তাঁর ভাই আম্রাকুকে পিছন থেকে বর্শা মেরে হত্যা করেন এবং তিনি সবাইকে এসে বলেন যে, এটা একটা দুর্ঘটনা, সাদা মহিষটি মারতে গিয়ে

দুর্ঘটনাবশতঃ বর্শাটি আম্রাকুর শরীরে লেগে তার মৃত্যু হয়েছে। আম্রাথুর একথাটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পেফু বিশ্বাস করলেন না। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। পরবর্তীকালে প্রু-মাং (প্রু-রাজা আক্ষরিক অর্থেঃ বর্মীরাজা? সম্ভবতঃ পেগুরাজা) আরাকান আক্রমণ করতে এলে পেফু প্রথমে তাদের পক্ষ নেন। কিন্তু পরে আবারও তিনি তাদের দল ছেড়ে আম্রাথুর দলে ভিড়ে যান। এর কিছুকাল পরে আম্রাথু মারা গেলে তিনি ১৬৪ সালে আরাকানের রাজা হন এবং এ বছরই তাবং (মার্চ-এপ্রিল) মাসে ম্রাউক-উ শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আম্রাথু তাঁর রাজত্ব কালের শেষ দিকে ম্রোদের কিছু সংখ্যক লোককে (সম্ভবতঃ আত্মীয়দেরকে?) ফোখনটং পাহাড়ে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

ম্রোরাজা প্রেফুর রাজত্বকালে দ্বাদশ বছর রাজত্বের সময় (১৭৬ সালে?) শান (Shan) জাতীয় লোকেরা আরাকান আক্রমণ করলে তিনি রানী ও মন্ত্রীদের নিয়ে রোফ্যা নামক শহরে পালিয়ে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। শানরা আরাকানের রাজধানী দখল করে তার ধনসম্পদ লুট করে। তারা আরাকানের বিখ্যাত মহামুনি মন্দিরের দেওয়াল আগুন লাগিয়ে ধ্বংশ করে এবং বহু লোককে ধরে নিয়ে যায়। এর পরবর্তীকালে ১২ বছর বা তার অধিক সময় ধরে একদিকে থেকে বার্মার শানরা ও অন্যদিক থেকে তালইংরা (Mon জাতীয় লোকেরা) আরাকানের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এরফলে আরাকানে ম্রোরাজত্বের অবসান হয়।

গোত্র ও বিবাহঃ ম্রোদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। তাদের পরিবারে পিতাই হলেন প্রধানব্যক্তি। তাদের সমাজে অনেকগুলো গোত্র বা গোষ্ঠী রয়েছে। যুদ্ধ, শান্তি, সহযোগীতা ও বিবাহে এ সকল গোত্রগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ম্রোদের গোত্রগুলি হলো- ঙারুয়া, ঙারিংচাহ, তাং, দেং, খউ, কানবক, প্রেনজু, নাইচাহ, তামতুচাহ, ইয়মরে ইত্যাদি। এদের মধ্যে ঙারুয়া গোত্রটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ঙারুয়া গোত্রটি এখানে চারটি উপগোত্রে বিভক্ত। এগুলো হলো-খাটপো, চিম্লুং, জংনাউ এবং চাউলা। এই চারটি উপগোত্র নামে চারটি উপগোত্র হলেও কার্যতঃ এরা প্রত্যেকটি এক একটি স্বতন্ত্র গোত্রের মত। এ কারণে ম্রোদের ঙারুয়াদেরকে চাকমাদের গঝা (লোক দল) গুলোর সাথে তুলনা করা যায়। ম্রো সমাজের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মিঃ ইরাচান মুরুং এ বিষয়ে আমাকে বিস্তারিত ভাবে যে সকল তথ্য জানিয়েছেন তা' হলো-

১. একই গোত্রের দুজন ছেলেমেয়ের মধ্যে বিবাহ হতে পারে না। যেমন একজন দেং গোত্রের ছেলের সাথে একজন দেং গোত্রের মেয়ের বিয়ে করা নিষিদ্ধ। তাকে বিয়ে করতে হবে নিজের অর্থাৎ স্বগোত্র বহির্ভূত অন্য গোত্রের মেয়েকে।

২. যুদ্ধ, সন্ধি বা অন্য কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে যদি দুইটি গোত্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্বসুলভ বন্ধুত্ব গঠিত হয়, তবে ঐ দু'টি গোত্রের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। রীতি অনুযায়ী উক্ত দু'টি অঙ্গীকারবদ্ধ গোত্র তাদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদিতে একে অপরকে ভাইয়ের মত সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, ঙারুয়াদের খাটপো বংশের সাথে তাম-তু-চাহ এবং ইয়মরে গোত্রের ভাই-ভাই সম্পর্ক রয়েছে। তাই তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ সম্পর্ক নিষিদ্ধ।

৩. ম্রোদের রীতি অনুযায়ী এক একটি গোত্রের ছেলেরা নির্দিষ্ট কতগুলি নির্দিষ্ট গোত্রের মেয়েদেরকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু ছেলেরা যে সকল গোত্রের মেয়েদেরকে বিয়ে করে, সে সকল গোত্রের ছেলেদেরকে তাদের মেয়েরা বিয়ে করতে পারেনা। তাদেরকে বিয়ে করতে হবে অন্য কযেকটি নির্দিষ্ট গোত্রের ছেলেদেরকে। যেমন 'ঙারুয়া'দের খাটপো গোত্রের ছেলেরা খউ, কান্‌বক্‌, নাইচাহ্‌ গোত্রের মেয়েদেরকে সব সময়ই বিয়ে করে আসছে। কিন্তু তাদের মেয়েদের ঐ সকল গোত্রের ছেলেদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

ম্রো-বিবাহঃ এ বিষয়ে আমি আমার লিখিত 'বাংলাদেশের উপজাতি' (ঢাকা ১৯৮৫ ইং) বইটিতে বিস্তারিত ভাবে লিখেছি। এখানে নীচে সংক্ষেপে তাদের বিয়ের রীতিনীতি বর্ণনা করা গেল। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় মঃ ইরাচান মুরুং আমাকে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন।

বিয়ের সময় একজন অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি সদ্য সংগৃহীত 'আইডাম' বা লাউ জাতীয় একটি খোলে মুখ ঢুকিয়ে ৬ বার ফুঁ দিযে মঙ্গল ধ্বনি করেন। এরপর তিনি কনের ডানহাতের মনিবন্ধে শূকরের একটি কানের টুকরাসহ একগাছি সূতা বেঁধে দেন। কনের হাতে সূতার গাছি বাঁধার পর এর বাড়তি অংশটি দা দিয়ে নীচ থেকে উপর দিকে ঘষে কাটা হয়। কনের পরে

বরের ডান হাতেও একই ভাবে বিয়ের সূতা বাঁধা হয়। এরপর বরের পরিবারের সর্বকণিষ্ঠ থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের হাতে ঐ সূতা বাঁধা হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্যায়ে কনে ডান হাতের তর্জনী (আঙ্গুলটি) দিয়ে চালের গুঁড়া বেশম স্পর্শ করে প্রথমে কপালে, তারপর বুকে এবং সবশেষে পিঠে লাগায় তারপর কনে আবার হলুদের গুড়াও একই ভাবে কপালে, বুকে ও পিঠে লাগায়। কনের পরে বরও প্রথমে চালের গুঁড়া এবং পরে হলুদের গুড়া কপালে, বুকে ও পিঠে লাগায়। এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করার পর তারা সমাজে স্বামীস্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

আন্তঃঙরুয়া বিবাহ সম্পর্ক			
১.	খাটপো	ছেলে x খাটপো মেয়ে–	বিয়ে হয় না। (যেহেতু একই বংশ)।
২.	খাটপো	মেয়ে + সিমলুং ছেলে	বিয়েহয়।
৩.	,,	ছেলে + জংনাউ মেয়ে	বিয়েহয়।
৪.	,,	ছেলে x চাউলা মেয়ে বিয়ে হয় না।	(যেহেতু ভাই–ভাই সম্পর্ক)

ঙারুয়াদের সাথে অন্যান্যদের বর্হিগোত্র সম্পর্ক			
৫.	খাটপো	ছেলে + তাং (১ম দলের) মেয়ে	বিয়েহয়।
৬.	,,	ছেলে x তাং (২য় ,,) মেয়ে	বিয়ে নয় না যেহেতু ভাই–ভাই সম্পর্ক)
৭.	,,	ছেলে + তাং (৩য় ,,) ,,	বিয়েহয়।
(উল্লেখ্য তাং গোত্রের তিনটি উপদল রয়েছে)।			
৮.	খাটপো	মেয়ে + দেং ছেলে	বিয়েহয়।
৯.	,,	ছেলে + খউ মেয়ে	বিয়েহয়।
১০.	,,	ছেলে x তাম্–চাহ্ মেয়ে	বিয়ে হয় না। (যেহেতু ভাই–ভাই সম্পর্ক)
১১.	,,	ছেলে + কান্‌বক মেয়ে	বিয়েহয়।
১২.	,,	মেয়ে + প্রেনজু ছেলে	বিয়েহয়।
১৩.	,,	ছেলে + নাইচাহ মেয়ে	বিয়েহয়।

ছেলে	ইয়মৃরে মেয়ে	বিয়ে হয় না (যেহেতু ভাই-ভাই সম্পর্ক)

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য ম্রোদের বংশ পরিচয় পিতৃধারায় নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে কোনো বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক দ্বিতীযবার স্বামী গ্রহণ করলে তার পূর্বতন স্বামীর ঔরসজাত ছেলে-মেয়েরা তার সাথে থাকলে তারা তার দ্বিতীয় স্বামীর গোত্র পরিচয় ধারণ করতে পারে।

ভাষা, নৃত্য ও গোহত্যা অনুষ্ঠানঃ মোদের নিজস্ব ভাষা আছে। Dr. G. A. Grierson তাঁর লিখিত Linguistic Survey of India (Vol-1, Part-1, Calcutta 1927) বইটিতে ম্রোদের ভাষাকে বর্মীদলের অন্তভূক্ত করেছেন এবং এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, "Mru or Mro is a puzzling language in many respects." পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রোদের ভাষা আমি ব্যক্তিগত ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। তাদের ক্রিয়াপদ ও বহুবচন গঠনে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের ভাষার সাথে বর্মী ভাষার চেয়ে কুকি-চিন ভাষাগুলির অধিক মিল রয়েছে। ফলে ম্রো-ভাষাকে বর্মীদল থেকে স্বতন্ত্র একটি ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

ম্রোরা সঙ্গীত ও নৃত্যপ্রিয় জাতি। নাচের আসরে যুবক ও যুবতীরা ঠোঁটে, কপোলে এবং কপালে রাঙ্গা রঙ লাগায়। যুবতীরা কানে ও খোঁপায় ফুল, কোমরে রূপার বিছা এবং গলায় নানা ধরণের পুঁতির মালা পরে। যুবক ও যুবতীদের নাচের আসরে কোন বিবাহিত মহিলাকে অংশ নিতে দেওয়া হয়না। এটি তাদের জন্য নিষিদ্ধ। যুবকেরা 'প্লুং' নামক বাঁশী বাজায়। লাউ জাতীয় এক ধরণের জংলী ফলের শুকনো খোলে ৪/৫টি ছোট ছোট বাঁশের লম্বানল মোম দিয়ে পুঁতে 'প্লুং' তৈরী করা হয়। ঐ সমস্ত ছোট বাঁশের টুকরা টুপীর মত থাকে। এ ছাড়া নাচের আসরকে আনন্দ মুখর করার জন্য কাসার ঘন্টা 'মং' বা 'গং' বাজানো হয়। নৃত্যের আসরে যুবকেরা বাঁশী বাজায় ও যুবতীরা সারিবদ্ধভাবে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে বাজনার তালে তালে নাচে।

ম্রোদের নৃত্যানুষ্ঠানগুলির মধ্যে গোহত্যা অনুষ্ঠান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এতে একটি গরুকে বধের জন্য নৃত্যের আসরে নিয়ে আসা হয়। প্রথমে একজন পুরোহিত 'আইডাম' বা লাউজাতীয় ফলের খোলে পরপর ৬বার ফুঁ দিয়ে মঙ্গলধ্বনি

করে এবং 'কাচা-মদ' মুখে নিয়ে ছিটাতে থাকে ও মন্ত্রপাঠ করে। যে বাড়ীর লোকেরা উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তারা একজন একজন করে কলাপাতায় রাখা চাউল ও আইডাম ফলের টুকরোগুলি হাতে নিয়ে পরপর পূজাস্থানে ৬ বার ছিটিয়ে বলে, "এই বাড়ীর আপদ বিপদ দূর হয়ে যাক।"

এইভাবে প্রত্যেক জনের ঐ অনুষ্ঠান সম্পাদন কালে পুরোহিত লাউজাতীয় খোলটিতে ফুঁ দিয়ে ৬ বার করে মঙ্গল ধ্বনি করতে থাকে। তারপর শুরু হয় নৃত্য। পরদিন যথারীতি গরুটিকে সামনের ডান পায়ের বগলের নীচ দিয়ে বর্শা মেরে বধ করা হয়। অতপর গরুটির জিহ্বা কেটে এটিকে একটি বাঁশের টুকরোয় গেঁথে পূজাস্থানের একটি গাছের খুঁটির উপর বেঁধে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে গরুটির মাংস দিয়ে ভোজ চলে।

গোহত্যা অনুষ্ঠান সম্পর্কে ম্রোদের একটি বিশ্বাস হলো- অতীতে সৃষ্টিকর্তা যখন তাদেরকে একটি ধর্মগ্রন্থ ও পোশাক দেন তখন এই গরুই সেগুলি তাদের কাছে নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে খেয়ে ফেলেছিল। তাই তারা গোহত্যা অনুষ্ঠানে গরু বধ করে থাকে।

ধর্মঃ ম্রোদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা রয়েছে। এখানকার ম্রোদের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তবে সাম্প্রতিক কালে তাদের এক তৃতীয়াংশের মত লোকজন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে।

পোশাক পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জাঃ ম্রোদের পুরুষেরা কোমরে সূতা জড়িয়ে তাতে নেংটির মত করে একটি সাদা কাপড় পরে। তারা মেয়েদের মত মাথায় লম্বা চুল রাখে এবং মাথার উপর ঝুঁটি বাঁধে। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই দাঁতে রঙ লাগায়। মেয়েরা নিম্নাঙ্গে ঘননীল রঙের একটি খাটো স্কার্ট পরে এবং বক্ষে সাধাণতঃ কোন ব্লাউজ বা কাপড় পরেনা। তারা কানে ও খোঁপায় নানা জাতীয় ফুল গুঁজে এবং গলায় নানা ধরণের পুঁতির মালা পরে থাকে।

চাক

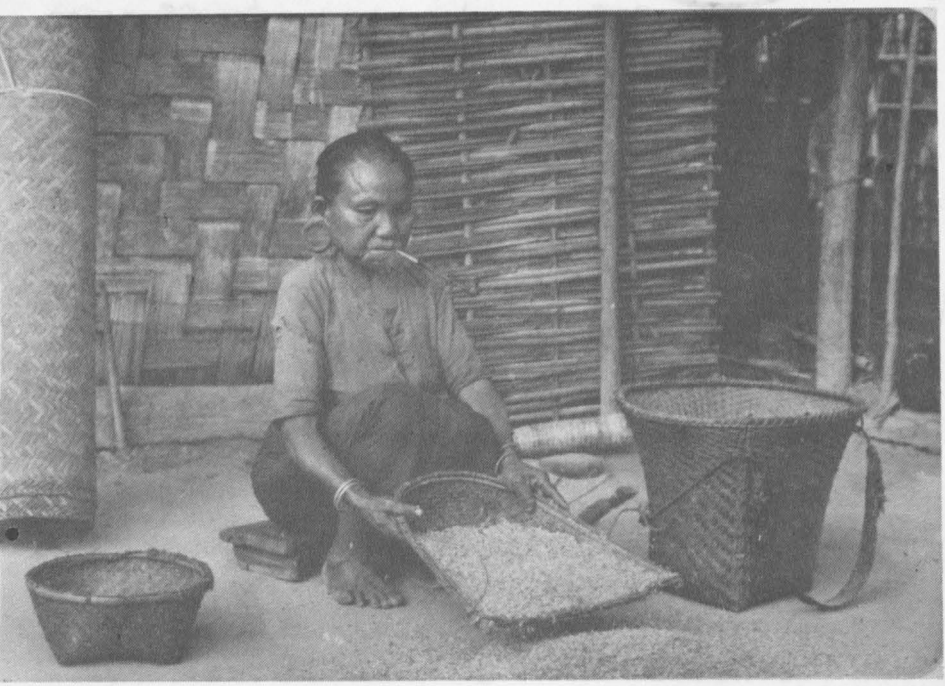

কর্মরত চাক মহিলা

চাক

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ক্ষুদ্র উপজাতিগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি হলো চাক (Chak)। তারা বান্দরবান পার্বত্য জেলার দক্ষিণাংশে বাইশারি, নাইক্ষ্যংছড়ী, আলিখ্যং, কোয়াংঝিরি, ক্রোক্ষ্যং ইত্যাদি মৌজাগুলোতে বাস করে। এখানে তাদের জনসংখ্যা কম। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারী রিপোর্ট থেকে ঐ সময় এখানে তাদের পরিবারগুলোর সংখ্যা ১৬৭ টি ছিল বলে জানা যায়। উক্ত আদমশুমারী রিপোর্টে এখানে প্রতি পরিবারে লোক সংখ্যা গড়ে ৫.৭৫ জন ধরা হয়েছিল। এই হিসেবে এখানে চাকদের জন সংখ্যা ১৯৮১ সালে মাত্র ৯৬০ জনের মত দাঁড়ায়। বর্তমানে চাকদের কেউ কেউ তাঁদের জনসংখ্যা তিন বা চার হাজারের মত হতে পারে বলে মনে করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব দিকে বার্মা বা অধুনা মায়ানমারের আরাকান রাজ্যেও চাকদের বসবাস রয়েছে। অনেকে তাদের জনসংখ্যা সেখানে এখানকার চাকদের জনসংখ্যার সম পরিমাণ হতে পারে বলে মনে করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকরা বর্তমানে তাদের নামের বানান CHAK (চাক) হিসেবে এখানে গ্রহণ করেছেন। তবে বার্মায় তাদের নামের বানান SAK (সাক) হিসেবে বর্মী ভাষায় লেখা হয়ে থাকে। বৃটিশ আমলে ১৯৩১ সারে যে আদমশুমারী (census of India) হয়, তা থেকে SAK (সাক) জনসংখ্যা ঐ সময় মাত্র ৬৯১ জন ছিল বলে জানা যায়।

সাম্প্রতিক কালে আরাকানী লেখক Mr. Thun Shawe Khaing বর্মী ভাষায় লেখা 'Rakhaing Mrauk Phya Daythama sak Taing Rang Thah Mya' (Akyab College 1988) নামক একটি গ্রন্থে আরাকানের বুসিদং, মমব্রা, মংডু ইত্যাদি স্থানে আকিয়াব শহরসহ ১৭টি গ্রামে বসবাসকারী Sak দের জনসংখ্যা ১৬০২ জন বলে লেখেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকরা তাদের নামের বানান

Chak (চাক) হিসেবে লেখে থাকলেও মূলতঃ তারা নিজেদেরকে 'আসাক' (Asak) বলে। আরাকানে বসবাসকারী Sak রাও তাদেরকে 'আসাক' বলে। উল্লেখ্য যে উত্তর বার্মার Myitkhyina জেলার Kadu (কাদু) জাতীয় লোকেরাও নিজেদেরকে 'আসাক' বলে।

চাক ঐতিহ্যঃ নৃতত্ত্বের দিক থেকে চাকরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির লোক এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের মেয়েরা কানে দুই ইঞ্চি ব্যাসের রৌপ্য কর্নদুল 'নাতং' পরে থাকে। এটি তাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য; যা দেখে সহজেই একজন চাক রমণীকে অন্যান্য উপজাতীয় রমণীদের থেকে আলাদা করা যায়।

ভাষাঃ এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যটি ব্যতীত চাকদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাদের ভাষা। এতদঞ্চলের ভাষাগুলোর মধ্যে চাকদের ভাষার ব্যাপারে জানার জন্য বিদেশী ভাষাবিদদের মধ্যে গভীর আগ্রহ ও কৌতূহল রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, চাক (Chak) বা সাক (Sak)দের ভাষার সাথে উত্তর বার্মার Myitkhyina জেলার Kadu (কাদু) এবং পূর্বভারতের মনিপুরের রাজ্যের Andro (আন্দ্রো), Sengmai (সেংমাই) ভাষাগুলোর মিল ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। এ প্রসঙ্গে Linguistic Survey of India Calcutta "১৯২৭) গ্রন্থে বিখ্যাত ভাষাবিদ Dr. G. A. Grierson নিম্ন লিখিত কথাগুলো লেখেছেন, "Kadu is spoken in the neighbouring Burma districts of Myitkyina, Katha, and upper Chindwin and Ganan in the last two of these. Ganan is merely a varient of Kadu, and its speakers as well as those of Kadu call themselves 'Asak'. This leads us on to Sak or Thet, spoken far away in the Akyab district which is allied to Kadu".

চাক ইতিহাসঃ এবার চাক বা আসাকদের অতীত ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করা যাক। Mr. Thun Shwe khaing (1988)-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, বিশিষ্ট আরাকানী পন্ডিত Mr. U Re Sein-এর মতে সুদূর অতীতে চাক বা আসাকরা এক সময় বার্মার উত্তর দিকে 'চীঃ খ্যৈ' নামক একটি এলাকায় বসবাস

করেছিল; পরে তারা সেখান থেকে 'য়ুঃখেং' অঞ্চলে প্রবেশ করে। এক সময় তারা চীনের য়ুনান প্রদেশের নিকটবর্তী বার্মার উত্তর সীমান্তে বসবাস করতে থাকে। সেখান থেকে তারা সালুইন নদীর উপরাংশের পার্বত্য ভূমি পেরিয়ে বড়নদী ইরাওয়াদীর তীরে পৌঁছে।

আরাকানী ইতিহাসকারদের লেখা থেকে জানা যায় যে, সুদূর অতীতে বর্মীরা চাক বা আসাকদেরকে "এককান ছিদ্রওয়ালা" ডাকতো (Thun Shwe Khaing:1988)। তাদের মতে ১০০ খৃষ্টাব্দের দিকে চীনের য়ুনান প্রদেশে কানে বড় ছিদ্রযুক্ত একটি জাতি ছিল। তাই চীনারা উত্তর বার্মার হুকং উপত্যকা থেকে উরুনদী পর্যন্ত অঞ্চলকে বর্মীদের মতে 'লানাঃ গ্রি' বলতো। সাম্প্রতিক কালে হংকং থেকে প্রকাশিত China Tourism No. ৭২-সংখ্যাতেও Lancang Jian নদী তীরবাসী Jinuo জাতীয় লোকদেরকে কানে বড় ব্যাস যুক্ত কর্ণদুল পরতে দেখা যায়।

বার্মায় পিউ (Pru or Pyu) জাতি দক্ষিণ বার্মায় থিরিক্ষেত্র শহর প্রতিষ্ঠা করে ৮৩২ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। অনেকে মনে করেন ঐ সময় আসাকরা পিউদের অধীনে ছিল। তারা সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর পূর্বে কোন এক সময় উত্তর বার্মায় Katha জেলায় ইরাওয়াদী নদীর তীরে প্রাচীন শহর Tagoung (তগৌং) গড়ে তুলেছিল বর্মী সম্রাট আনোয়ারাথা (১০৮৮-১০৯৯ খৃঃ) কাদুদের কাছ থেকে এই শহরটি দখল করেছিলেন। তা সত্ত্বেও এখনও প্রায় জনশ্রুতি গুলিতে তগৌং-কে আসাকদের শহর বলা হয়। উল্লেখ্য যে এখানে Katha জেলায় বসবাসকারী Kadu (কাদু) জাতীয় লোকেরাও চাকদের মত নিজেদেরকে Asak (আসাক) বলে। বার্মার প্রাচীন রাজধানী Pagan (পগাঁ) থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে ৮মাইল দূরে Turang (তুরং) নামে একটি পর্বত আছে। প্রফেসর G. H. Luce তাঁর লিখিত Hill Ruling the Thets লেখাতে ঐ পর্বতে অতীতে চাকদের বসতি থাকায় ঐ পর্বতকে 'Sak Culw Ton' বলা হতো বলে মন্তব্য করেছেন।

১১৩৩ খৃষ্টাব্দে. লিখিত Myazedi inscription থেকে Sakmunalon নামক একটি চাক গ্রামের কথা জানা যায়। তারা কোন সময় আরাকানে প্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে সঠিক ভাবে জানা যায় না। Mr. G. E. Harvey সাহেব Burma Research Society এর ৪৪ নং জার্নালে "Bayinnaung's living

descendant: The Mogh Bohmong" নামক একটি লেখাতে লেখেছেন যে, কারর কারর ধারণা মতে বর্মী সম্রাট Alaungsithu (১১১৩-১১৬৩) এর শত্রু Kadon জাতিতে চাক ছিলেন। তিনি বুসিদং শহরের ৫ মাইল দূরে -Thabeik-Taung এলাকায় নিজেকে প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরে ম্রাউক-উ শহর থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত আরাকানের প্রাচীন রাজধানী ওয়েথালী শহর থেকে তার রাজধানী Pyinsa-sambawut শহরে স্থানান্তিরিত করেছিলেন। এখনও আরাকানে Pyinsala নামকটি তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আরাকানী ইতিহাসকারেরা মাংথি (১২৭৯-১৩৭৪ খৃঃ?)-এর রাজত্বকালে যে 'আহ্রিঃ সাক্' (পূর্বের সাক) দেরকে বিতাড়ন ও বিজয়ের কথা লিখে থাকেন, এরা সম্ভবতঃ শান অথবা চাক হতে পারে। সম্ভবতঃ অতীতে কোন এক সময় আরাকান থেকে চাকদের একটি দল বাঘখালী নদীকে অনুসরণ করে ও অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছিল। যে কারণে এখনও তাদেরকে বাঘখালী (বাকখালী) নদীর উত্তর দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে নাইক্ষ্যংছড়ি, বাইশারি ইত্যাদি এলাকায় দেখা যায়। Dr. G. A. Grierson চাকদের ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনৈক Taylor (1927) সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়ে Linguistic Survey of India. Vol-1, Part-1 নিম্নলিখিত কথাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন-Mr. Taylor tells us that according to Burmese in early days that Saks inhabited the upper part of Irrawaddy valley. Some of these are supposed to have travelled from their original settlement in North Burma in a South-Westernly direction into Arakan. He suggests that some of them have passed on into Manipur and became the ancestors of the Andro and Sengmai tribes. another possible explanation is that the original Kadu-Saks, while still in North Burma, spread also into Manipur, and that the Andro and Sengmai were left behind there, like the Kadus of Myikhyina and the neighbourhood, when the Saks migrated to the South West. The facts that they must have been very very early settlers there, and that they were found there by the Meithei men when they conquered

the country. চাক বা আসাকদের ইতিহাস সম্পর্কে এ পর্যন্ত আলোচনার পর, এ বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, তাদের ইতিহাস ও ভাষা সম্পর্কে আরও অধিক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে মনিপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকানে বসবাসকারী এই ভোট–বর্মী শাখার অন্তর্গত Sak or Lui group-এর চাক বা আসাকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নামের সাদৃশ্য দেখানো হলো–

দেশ অঞ্চল জনগোষ্ঠীর নাম
ভারত মনিপুর আন্দ্রো (Andro)
বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম (বান্দরবান জেলায়) আন্দো (Ando)
বার্মা আরাকান আনদুং (Andung)

চাক গোত্রঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকদের মধ্যে দু'টি গোত্র আছে। গোত্র দু'টি হলো– ১. আন্দো (Ando) এবং ২. ঙারেক (Ngarek). তাদের সমাজে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের সময় এ দু'টি গোত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। চাকদের রীতি অনুযায়ী সমগোত্রে অর্থাৎ একই গোত্রের দুজন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। রীতি অনুযায়ী একজন আন্দো গোত্রের ছেলেকে বিয়ে করতে হবে একজন ঙারেক গোত্রের মেয়েকে। একজন আন্দো গোত্রের ছেলে কখনও একজন আন্দো গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। আর একই ভাবে একজন ঙারেক গোত্রের ছেলেকেও বিয়ে করতে হবে একজন আন্দ্রো গোত্রের মেয়েকে। সে একজন ঙারেক গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। এই জাতীয় রীতি চাক সমাজে কেবল বিয়ের ক্ষেত্রে নয়, মৃত্যুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আন্দো গোত্রের কোন পুরুষ মারা গেলে তার মৃতদেহ দাহ করারদায়িত্ব হলো ঙারেক গ্রোত্রে অবস্থানকারী তার ভাগ্নেদের। মৃত যদি আন্দো গোত্রের কোন স্ত্রীলোক হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও তার মরদেহ দাহ করার দায়িত্ব হলো ঙারেক গোত্রে অবস্থানকারী তার ভাইপো অর্থাৎ ভাইয়ের ছেলেদের। এখন মৃত যদি ঙারেক গ্রোত্রের কোন পুরুষ হয়ে থাকে তবে তার মৃতদেহ দাহ বা সৎকার করার ভার পড়বে আন্দো গোত্রে অবস্থানকারী তার ভাগ্নেদের। আর মৃত যদি ঙারেক গোত্রের কোন স্ত্রীলোক হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তার মৃতদেহ দাহ করার ভার পড়বে আন্দো গোত্রে অবস্থানকারী তার ভাইপোদের। মৃতদেহ সৎকার করার বেলায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য

উপজাতীয়দের মধ্যে এই জাতীয় রীতি নেই। এক্ষেত্রে চাকদের রীতিকে ব্যতিক্রম বলতেহবে।

জন্মঃ এবার চাক সমাজের জন্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের বর্ণনা করা যাক। এ বিষয়ে ১৯৮২ মিঃ মং মং চাক, 'চাক উপজাতি পরিচিতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে যা লেখেছেন তা' সংক্ষেপে হলো–কোন চাকের গৃহে শিশুর জন্ম হলে প্রথমে শিশুটিকে স্নান করানো হয়। এরপর একটি পাত্রে ভাত ও পানি এবং সেগুলোর উপর একটি জ্বলন্ত অঙ্গার রেখে আঁতুড় ঘরে নিয়ে আসা হয়। একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক সুতের একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে তা নব জাতকের হাতে ও পায়ে করায়। এরপর ঐ ভাত ও পানি বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। নবজাতকসহ প্রসূতিকে ঐ আতুড় ঘরে সাধারণত ৮/১০ দিন থাকতে হয়। এরপর যেদিন প্রথম নবজাতককে আতুড় ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয় সেদিন তারদেহে বিশেষ ভাবে তৈরি 'পবিত্রজল' ছিটানো হয়। এতে ভবিষ্যতে সে সুস্থ হয়ে বড় হয়ে উঠবে এবং তার দেহে রোগব্যধি কম হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। শিশুটির নামকরণের দিন তার জন্য প্রথম দোলনা তৈরি করা হয়। ঐ সময় আত্মীয় সজনেরা তাকে কাপড় চোপড় ও টাকা দিয়ে আর্শীবাদ করে। এরপর শিশুটি বড় হয়ে কৈশোর ও যৌবনে পা দিলে সে তার সঙ্গীদের নিয়ে দল বেধে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে।

চাক বিবাহঃ অতীতে চাকদের প্রতিটি গ্রামে যুবকদের ঘুমানোর জন্য আলাদা বাড়ী বা নির্দিষ্ট বাড়ী থাকতো। সারাদিন যুবকেরা কাজকর্ম করার পর নিজ নিজ বাড়ীতে খাওয়া শেষ করে ঘুমানোর জন্য ঐ নির্দিষ্ট বাড়ীতে ঘুমাতে যেত। এখানে তাদের একজন দলপতি থাকতো। এই যুবনেতাই ঠিক করে দিত কোন সন্ধ্যায় বা রাত্রে কোন যুবক কোন যুবতীর কাছে প্রেম নিবেদন বা গল্পগুজব করতে যাবে। চাক যুবতীদের অবশ্য ঘুমানোর জন্য যুবকদের মত কোন নির্দিষ্ট বাড়ী থাকতো না। তবে তারা কয়েকজন মিলে দল বেঁধে কোন প্রভাবশালী আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকতে যেতো। আর এখানেই যুবকদের সাথে সন্ধ্যায় তাদের দেখা ও কথা হতো। অতীতে যুবক ও যুবতী উভয়েই 'খ্রেখং' নামক এক জাতীয় বাঁশের তৈরি ছোট আকারের মাউথ্অর্গেন বাজাতো এবং তা বাজিয়ে মনের ভাব আদান প্রদান করতে ভালবাসতো।

এদিকে ছেলে বিবাহযোগ্য হলে তার পিতামাতা শুভদিন দেখে পাত্রী ঠিক করতে যায়। পাত্রীর পিতামাতা রাজী হলে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়। পাত্রী পক্ষ কণ্যাপণ হিসেবে পাত্রপক্ষের কাছে অলংকার, পোশাক পরিচ্ছদ ও নানা সামগ্রী দাবী করে থাকে। দাবী দাওয়ার মধ্যে খানাপিনার জন্য অনেক সময় শূকরও থাকে (Thun Shwe Khaing: ১৯৮৮)

নির্ধারিত বিয়ের অনুষ্ঠানের দুইদিন পূর্ব থেকে কনের বাড়ীতে তার আত্মীয়স্বজনেরা মিলিত হয়। কনে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদেরকে প্রণাম জানিয়ে তাদের আর্শীবাদ নেয়। মূল বিবাহ অনুষ্ঠানের একদিন পূর্বে একবার আমি একটি চাক কনের বাড়ীতে দু'জন বৃদ্ধা মহিলাকে বিষাদ সুরে গান করতে দেখেছি। এ জাতীয়দৃশ্য এখনও পর্যন্ত উপজাতীয় সমাজে আর কোথাও দেখতে পাইনি। ঐ অনুষ্ঠানে কনে আমাকেও প্রণাম জানিয়ে আর্শীবাদ নিয়েছিল। উপস্থিত উপরিস্থ ব্যক্তিরা অর্থ দিয়ে কনেকে আর্শীবাদ করেছিল। কনে তাদেরক মদ ও পানসুপারী দিয়ে আপ্যায়িত করেছিল।

বিয়ের দিন বরযাত্রীরা কনের জন্য সঙ্গে করে অলংকারপত্র, ও পোশাকপরিচ্ছদ এবং অন্যান্যদের জন্য খিলিপান, মদ, মোরগমুরগী, আখ, কলা, নিয়ে যায়। তারা অনেক সময় সাথে করে ডেকচি এবং দা নিয়ে যায় (Thun Shwe Khaing: ১৯৮৮) বরযাত্রীরা কনের বাড়ীর প্রাঙ্গনে পৌছলে কনের বাড়ীর একজন লোক আনুষ্ঠানিক ভাবে বরকে ডেকে কনের বাড়ীতে মাচাং ঘরে ওঠার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে কনের কক্ষে নিয়ে যায়। এখানেই বিয়ের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। বাইশারি মৌজার জনৈক চাক হেডম্যানের ছেলে উ চ হ্লার কাছ থেকে চাক বিয়ের অনুষ্ঠানটির ব্যাপারে যা জানতে পেরেছি তা নিম্নরূপ–

বিয়ের অনুষ্ঠানে বর ও কনেকে পরস্পরের মুখোমুখি বসানো হয়। তাদের সামনে বেতের তৈরি দু'টি টেবিলে কলাপাতার উপর ভাত ও মদ আর পাশে দু'টি মদের বোতল রাখা হয়। ইতিপূর্বে বরপক্ষ কর্তৃক আনীত মোরগ ও মুরগী দু'টি বিনা রক্তপাতে মেরে ফেলে সেগুলির পালক ছাড়ানো হয় ও নাড়িভুঁড়ি, নখ ইত্যাদি ফেলে দিয়ে পরিস্কার করার পর সেগুলিতে হলুদ গুলে আস্ত সিদ্ধ করে বিয়ের অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা হয়। এ সকল কাজ রীতি অনুযায়ী বরপক্ষের লোকদেরকেই করতে হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে আস্ত সিদ্ধ করা মোরগটি বরের সামনে পূর্বোক্ত কলাপাতার উপর রাখা হয়

এবং সিদ্ধ করা মুরগীটিও কনের সামনে রাখা ছোট টেবিলটির কলাপাতার উপর রাখা হয়। এরপর মোরগ ও মুরগীর জিহ্বা বাইরে টেনে শুভাশুভ গণনা করা হয়। মোরগ ও মুরগীর জিহ্বা টানার পর ঐ গুলি সামনের দিকে ঝুকে থাকলে এই বিয়ে বর ও কনের জন্য মঙ্গলের হবে বলে ধরা হয়। এরপর আসে বিয়ের অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্যায়। বরের সামনে রাখা মদের গ্লাসটিতে মদ ঢালা হয় সে তা মুখের কাছে নিয়ে ফুঃ ফুঃ শব্দ করে কনের হাতে তুলে দেয় কনে তা পান করে বা কমপক্ষে মুখে নিয়ে জিহ্বা দিয়ে স্পর্শ করে।

অনুরূপ ভাবে কনের সামনে রাখা গ্লাসেও মদ ঢালা হয়। সেও বরের মত তা মুখে নিয়ে ফুঃ ফুঃ শব্দ করে বরের হাতে তুলে দেয়। বর তা পান করে। এভাবে উভয়ে বিয়ের মদ পান করলে বিয়ের অনুষ্ঠান সুম্পন্ন হয় এবং সমাজে তারা স্বামীস্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

মৃত্যুঃ এবার চাকদের মৃত্যু সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের কথায় আসা যাক। কোন চাকের মৃত্যু হলে তার আত্মীয়েরা তার মৃতদেহ দাহ করে। তারা মৃতের আত্মার সদগতি কামনা করে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে সাত দিন ধরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে 'স্যং' (ভাত-তরকারি) দান করে এবং সেখানে বুদ্ধের কাছে মৃতের আত্মার শান্তি ও সদগতির জন্য প্রার্থনা করে।

খ্যাং

একদল চাকমা মহিলা

খ্যাং

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ক্ষুদ্র উপজাতি হলো খ্যাং (Khyang)। বর্মীদের উচ্চারণে 'খ্যাং' নামটি অনেক সময় 'ছ্যাং' এর মত শুনানোর ফলে ইংরেজরা তাদের নাম Chin (চিন)ও লেখে থাকেন। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কাপ্তাই ও চন্দ্রঘোণার অনতীদূরে খ্যাংদের কয়েকটি গ্রাম রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারী রিপোর্টে খ্যাংদের পরিবার সংখ্যা ২৬১টি ছিল বলে জানা যায়। ঐ সময় প্রতি পরিবারে গড়ে ৫.৭৫ জন লোক ধরায় তাদের জনসংখ্যা আনুমানিক ১৫০১ জনের মত ছিল বলে জানা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের জনসংখ্যা বর্তমানে এরচেয়ে বেশী হবে বলে মনে হয়।

ইতিকথাঃ আরাকানেও খ্যাং রয়েছে। তাদের সম্পর্কে Sir Arthur P. Phayre তাঁর লিখিত 'An account of Arakan' (Journal of the A siatic Society of Bengal, Vol-X, No. 117, P. 683 Calcutta 1841) প্রবন্ধটিতে লেখেছেন, "The next hill tribe is Khyeng. There is comparatively a small number of this people within our border, that is to say, within the actual bounds of Brithish authority in Arakan; only those who live on near to the banks of Lemyo river, are subject to our control. Eastward of this river, up to the great Yumataung range, there are powerful tribes of this people, who rejoice in perfect freedom, (as long at least as they can defend themselves from the attacks of their neighbours). They are seperated from British authority by pathless mountains and forests, and being to the west of the Yumataung range, the Burmese

have no dominion over them; many indeed to the eastward of those mountains are virtually independent of Burma." পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্যাংরা কবে এসেছিল তা স্পষ্ট নয়। মিঃ প্রদীপ চৌধুরী সাম্প্রতিক কালে গিরিনির্ঝর (৩য় সংখ্যা, ১৯৮৩ ইং) পত্রিকায়'খিয়াং উপজাতি' শীর্ষক একটি লেখাতে এ বিষয়ে তাদের সমাজে প্রচলিত একটি জনশ্রুতির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত জনশ্রুতি মতে তাদের কোন এক রাজা এক যুদ্ধের সময় বার্মা থেকে এদিকে পালিয়ে আসেন এবং স্বদেশে ফিরার সময় তাঁর ছোটরাণীকে অন্তসত্ত্বা অবস্থায় এখানে ফেলে যান। খ্যাংদের ধারণা তারা এখানে ছোটরানীর সাথে থেকে যাওয়া লোকদেরই বংশধর। এখানে উল্লেখ্য যে, এই জাতীয় জনশ্রুতি বার্মার কোন কোন খ্যাংদের মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে (Sir. A. P. Phayre: 1841 দ্র)

টোটেমিক বৈশিষ্ট্য ও উল্কির ব্যবহারঃ খ্যাংরা নিজেদেরকে শো (Sho) বা (Shu)বলে। এখানকার উপজাতিদের মধ্যে একমাত্র তাদের গোত্রগুলির নামে স্পষ্ট ভাবে টোটেমিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা–

১. মিন্‌চ সং (বিড়াল গোত্র), ২. য়ুংচ সং (বানর গোত্র),
৩. ইউ সং (ইঁদুর গোত্র) ইত্যাদি।

মঙ্গোলীয় গোষ্ঠিভুক্ত খ্যাংরা খুব সুন্দর চেহারার অধিকারী। বৃটিশদের লেখা থেকে জানা যায় যে, খ্যাং রমণীদের সৌন্দর্যের কারণে অতীতে প্রায়ই বর্মী এবং অন্যান্য উপজাতীয় লোকেরা তাদের ধরে নিয়ে যেতো। এইজন্য তাদের সৌন্দর্য ক্ষুন্ন করার জন্য অতীতে তাদের মুখে নানা ধরণের উল্কি এঁকে দেওয়া হতো। বর্তমানে অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের খ্যাং রমনীরা মুখে উল্কি আঁকেন না।

ধর্মঃ খ্যাংরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তবে সাম্প্রতিক কালে তাদের কিছু লোকজন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে।

খ্যাং ভাষাঃ খ্যাংদের নিজস্ব ভাষা আছে। তাদের ভাষা কুকি–চিন (Kuki-Chin) দলের অন্তর্ভুক্ত। তাদের ভাষায় নদীতে হলং (hataung) বলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাসালং, মাসালং, আসলং, ক্যসলং, কুহলং মিজোরাম ও ত্রিপুরার টলং, (ধ্বলেশ্বরী) আরাকানের ওয়াথালং, হুসলং নদীগুলির নামের শেষে যে 'লং' শব্দটি নদী অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, তা এখানে খ্যাং ভাষায়ই কেবল বর্তমানে অর্থবহ।

খুমি

ঝুড়ি বুননরত একজন উপজাতিয় (চাকমা)

খুমি

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম ক্ষুদ্র একটি উপজাতি হলো খুমি (Khumi)। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারী রিপোর্টে ঐ সময় এখানে খুমিদের পরিবার সংখ্যা ২১৮টি ছিল বলে জানা যায়। উক্ত আদমশুমারী রিপোর্টে প্রতি পরিবারে গড়ে ৫.৭৫ জন লোক ধরা হয়েছে। এ থেকে খুমিদের লোকসংখ্যা ঐ সময় আনুমানিক ১,২৫৪ জনের মত ছিল বলে জানা যায়। খুমিরা বান্দরবান পার্বত্য জেলায় রুমা ও থানচি এলাকায় বাস করে। আরাকানেও খুমিদের বসবাস রয়েছে। Mr. B. H. Hadson কর্তৃক On the Indo Chinese Borderers and their connection with the Himalays and Tibetans নামক একটি লেখা থেকে জানা যায় যে ১৮৫৩ সালে সেখানে খুমিদের লোকসংখ্যা ৪,১২৯ জন ছিল (Journal of the Asitic Society of Bengal, Vol-XIII (1) দ্র)। আরাকানে খুমিদের একদল নিজেদেরকে Kami বা Kimi এবং অপরদল তাদেরকে Kumi বলে।

খুমি ইতিকথাঃ Captain T. H. Lewin এর The hill tracts of Chittagong and the dwellers therein (Calcutta 1869) বইটি থেকে জানা যায় যে, আরাকানে খুমি ও ম্রোদের মধ্যে একটি প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল। ঐ সংঘর্ষে জয়ী হয়ে খুমিরা ম্রোদেরকে এদিকে বিতাড়িত করে দেয় এবং পরে সম্ভবতঃ তারাও অন্যান্যদের চাপে পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে আসে। তাদের পুরাতন বাসস্থলে সেখানে খ্যাংরা বসতি স্থাপন করে (Hodson: 1853)।

অস্ত্রসস্ত্র ও যুদ্ধবিজয় নৃত্যঃ অতীতে খ্যাংরা খুবই যুদ্ধংদেহী উপজাতি ছিল। তারা যুদ্ধে নানা ধরণের অস্ত্রসস্ত্র ব্যবহার করতো। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে Sir Arthur P. Phayre লেখেছেন, " Different clans of Kumis attack each other; there is a feeling of jealousy between clans of the same tribe

living upon different streams, and those clans of Kumis living beyond the British frontier, consider those within as fair game. Their native arms for attack and defence are spears, bows, arrows, and speare leathern shields, about three and a half feet long, by two feet broad. Even most distant tribes now posses muskets and ammunition, which are conveyed up the Koladan by petty merehants, and thence passed from tribe to tribe far into interior. They use poised arrows in the chase, but I think not in war.

(A. P. Phayre: 1841).

ভাষাঃ খুমিদের নিজস্ব ভাষা আছে। তাদের ভাষা কুকি-চিন দলের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মঃ খুমিরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

লুসেই, পাংখো এবং বোম

বোম তরুনী

সৌজন্যে ঃ কল্পতরু

লুসেই, পাংখো এবং বোম

পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বাংশে বসবাসকারী তিনটি কুকি-চিনভাষী গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি হলো-লুসেই (Lushei), পাংখো (Pankho) এবং বোম (Bawm)। লুসেইরা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সাজেক এলাকায়, পাংখোরা বিলাইছড়ি এলাকায় এবং বোমরা বান্দরবান পার্বত্য জেলায় রুমা এলাকায় অধিক হারে বাস করে। লুসেইদের মূল বসবাস ভারতের মিজোরাম বা লুসাই পাহাড়ে। সেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি। ১৯৬১ সালে সেখানে তাদের লোকসংখ্যা ২,১১,৮০৭ জন ছিল। পাংখোদের বিশ্বাস অতীতে তারাও মিজোরামে পাংখোয়া নামক একটি গ্রামে বাস করতো। তাদের ভাষায় 'পাং' অর্থ শিমুল ফুল আর 'খোয়া' অর্থ গ্রাম। বোম নামটি উদ্ভূত হয়েছে বোমজাও শব্দ থেকে। যার অর্থ সংযুক্ত জাতি। 'পাংহয়' ও 'শুনথ্লা' নামক দু'টি জনগোষ্ঠীর মিলনের ফলে বোমজাও শব্দটি গঠিত হয়েছিল (লালনাগ বোম, ১৯৮১; অঙ্কুর, ১ম সংখ্যা, উপজাতি পরিচিতি, বোম দ্রঃ)।

জনসংখ্যাঃ বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারী রিপোর্ট থেকে কুকি-চিন ভাষী এই তিনটি উপজাতির পরিবার সংখ্যা ও লোকসংখ্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণা পাওয়া যায়-

ক্রমিক উপজাতি পরিবার সংখ্যা আনুমানিক লোকসংখ্যা

(প্রতি পরিবারে গড়ে ৫.৭৫)

১. লুসাই ১৯১ .....১,০৯৮

২. পাংখোয়া .. ৪১৮ ... ২,৪০৪

৩. বোম .. ১,০৫২ .... ৬,০৪৯

Dr. G. A. Grierson তাঁর লিখিত Linguistic Survey of India (Calcutta 1927) বইটিতে এদের জনসংখ্যা লেখেন Lushei 40,539, Banjogi 800, Pankhu 500.

ধর্মঃ অতীতে এ সকল উপজাতির নিজস্ব বহুবিধ ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস ছিল। বর্তমানে এ সকল উপজাতিরা সকলেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। ফলে তাদের জীবনযাত্রা পোশাক পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে।

ইতিকথা ও ইতিহাসঃ সুদূর অতীতকাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি কুকি-চিন ভাষী বিভিন্ন উপজাতির কাছে পরিচিত ছিল। অতীতে তারা শিকার করার জন্য এই অঞ্চলে আসতো বলে বৃটিশদের লেখালেখি থেকে জানা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সময় লুসেই সহ বিভিন্ন কুকি-চিন ভাষী সর্দারেরা চাকমা রাজা ও দেওয়ানদেরকে শক্তি যুগিয়ে ছিল। বিশেষতঃ তারা যখন ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল তখন কুকি-চিন ভাষী দুর্ধর্ষ লোকেরা চাকমা দেওয়ানের পিছনে ছিল। ১৭৮৯ সালে দিকে লুসেইরা সাইলো-পরিবারের নেতৃত্বে মিজোরামের অধিকাংশ এলাকার উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে (Dr. B. B. Goswami, 1979; The Mizo Unrest) তাদের নেতা Lallua ঐ সময় তাদেরকে নেতৃত্ব দেন। এই পরিবারের পূর্ব পুরুষ Thangura অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে অথবা তৎপূর্বে লুসেই দেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর গ্রামের নাম ছিল ট্রাংকুয়া। Thangura-এর পরিবার থেকে পরবর্তী কালে ৬ জন দুর্ধর্ষ লুসেই সর্দারের জন্ম হয়েছিল। তাঁরা হলেন-1. Rokum, 2. Zadeng, 3. Thangluah, 4. Pallian, 5. Rivung এবং 6. Sailo এদের মধ্যে থাংলুয়াহ্ ও রিভুং পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে প্রবেশ করেছিল। এ সম্পর্কে Colonel J. Shakespear সাহেব তাঁর লিখিত The Lushei Kuki Clans (1912) বইটিতে লেখেছেন, "The Thangluah and Rivung took a more souherly course. The latter penetrated into what is now the Chittagong Hill Tracts, and a chief named Vanhnuai-Thanga had a very large Village on the Long teroi hill, between the Chengri and Kassallong rivers. He died

about 1850, and shortly after his death the village was destroyed by Vutaia.

এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণে বোমরা Liankung সর্দারের নেতৃত্বে ১৮৩৮–১৮৩৯ সালের দিকে প্রবেশ করে ও তৎকালীন বোমাং–এর অনুমতিক্রমে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় থেকে যায়। তৎপূর্বে ১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসে ২৩ বা ২৪ বছর বয়স্ক বোম নেতা Liankung আরাকানের কোলাদন নদীর উপত্যকায় Hleng Kreing নামক একজন শক্তিশালী খুমি সর্দারের গ্রামে হামলা চালায় যাতে ৩০/৪০ জন লোক নিহত হয় ও শিশুসহ ৩৮ জন স্ত্রীলোককে বন্দী করা হয়। তখন তাদের বিরুদ্ধে আরাকানের স্থানীয় ব্যাটালিয়নকে পাঠানো হলে Liankung তাদের গ্রাম ছেড়ে এদিকে পাহাড়ের অভ্যন্তরে চলে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে Liankung আরাকানের ইংরেজ অফিসার A. P. Phayre সাহেবের সাথে দেখা করেছিলেন, ইংরেজদের মধ্যস্থতার ফলে খুমি সর্দারের একটি কন্যাসহ ৩৩ জন স্ত্রীলোককে তাদের শিশুদের সহ ফেরত পাঠানো হয়। দুইজন স্ত্রী লোককে বোমরা হত্যা করেছিল এবং Sendu উপজাতীয়দের কাছে ৩ জন স্ত্রী লোককে তারা বিক্রি করেছিল (Sir. A. P. Phayre: ১৮৪১)। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মিজোরাম থেকে দুর্ধর্ষ লুসেই ও অন্যান্য কুকি–চিন ভাষী উপজাতিররা বার বার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর হামলা করে লুণ্ঠন ও হত্যা চালাতে থাকে। তারা লোকজনও মিজোরামে ধরে নিয়ে যেত। তাদের এ সকল হামলার কারণে এতদঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটিশরা ১৮৬০ সালে এই অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করেছিল। তারপরও তাদের উৎপাত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃটিশরা তাদের বিরুদ্ধে সেনা পাঠিয়েছিল যা ইতিহাসে লুসেই অভিযান নামে পরিচিত। এ বিষয়ে Col. J. Shakespear লেখেছেন, "The Howlongs, who caused much anxiety on the Chittagong frontier from 1860 to 1890, Lalul's descendants whose doing fill the records of Silchar from nearly a century. Vonolel, Savunga, and Sangvunga, against whom the two columns of Lushei Expedition of 1871-72 were directed, all these were Sailos."লুসেই অভিযানের পরবর্তীকালে বৃটিশরা ১৮৯৩ সালে South Lushei hill district গঠন করলে লুসেইরা শান্ত হয়ে জীবনযাপন

করতে শুরু করে। এর পরবর্তীকালে খৃষ্টান মিশনারীরা মিজোরামে গিয়ে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করলে তারা অতীতের ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাস ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়।

নরমুন্ড শিকার প্রথাঃ অতীতে কোন কোন দুর্ধর্ষ কুকি-চিনভাষী উপজাতি এতদঞ্চলে এসে নরমুন্ড শিকার করে স্বদেশে ফিরে গেছে। এ বিষয়ে Mr. R. H. S. Hutchinson (1909) লেখেছেন যে ১৮৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে Lieutenant Stewart যখন একটি সার্ভে পার্টি নিয়ে অল্পসংখ্যক পুলিশসহ রাঙ্গামাটির অতি সন্নিকটে সার্ভেরত ছিলেন তখন Poi উপজাতীয় লোকেরা নরমুন্ড শিকারের উদ্দেশ্যে তাদের উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে নিহত করেছিল। তিনি এই হামলার কারণ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেখেন, "It subsequently transpired that Howsata, the Poi Chief, was in treaty to marry one of the princesses of the Tlang Tlang tribe, and a certain number of heads was demanded as a part of the marriage portion." এই প্রথা বৃটিশ আমলে লোপ পেয়েছিল।

বোমদের দল ও উপদলঃ অতীতে বোমরা নিজেদেরকে 'লাই' বা 'লাইমি' বলে পরিচয় দিত (লালনাগ বোম; ১৯৯১ ইং)। আরাকানীরা বোমদের কে Lungkhe (লাংখে) বলে (A. P. Phayre: 1841)। পূর্বে বলা হয়েছে যে বোমরা দু'টি দলের সংযোগে একটি উপজাতিতে পরিণত হয়েছে। এ দু'টি দল হলো পাংহয় এবং শুনথ্লা। নীচে মিঃ লালনাগ বোম (১৯৮১ ইং)-এর লেখা থেকে এ দু'টি দলের নাম দেওয়া গেল-

পাংহয় দলের উপদলগুলি হলো- ১. সাইলুক, ২. ইচিয়া, ৩. লেংতং, ৪. নাকো, ৫. কমলাও, ৬. থাংমিং, ৭. শামস্নাং, ৮. সাংলা, ৯. পংকেং, ১০. রোখো, ১১. আমলাই, ১২. খেংখোং, ১৩. চাহো, ১৪. রিপিচাই, ১৫. তাংথিং, ১৬. চারাং, ১৭. পালাং, ১৮. সেতেক, ১৯. কাইহন, ২০. মিলো, ২১. মিলাই, ২২. সাখং এবং ২৩. তেমু।

শুনথ্লা দলের উপদলগুলি হলো -১. চীন জাও, ২. লমছেও, ৩. বয়তুং, ৪. মারাম, ৫. জিঙুর, ৬. থ্লাওযাং, ৭. আওহেং, ৮. ভানদির, ৯. চলারাং প্যাও, ১০.

চেওলেই, ১১. আওন্ডির, ১২. লেইতাক, ১৩. লালনাম, ১৪. চেওরেক, ১৫. দেমুরেং এবং ১৬. প্যাপু।

উল্লেখ্য যে, বোমদের চীনজাও উপদলের সাথে আরাকানের সেন্দুদের Tjin-dzo গোত্রের নামগত মিল রয়েছে।

লুসেই–পাংখো ও বোমদের চুল বাঁধার বৈশিষ্ট্যঃ এই তিনটি উপজাতির মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির মিল অতীতে থাকলেও একটি বিষয়ে অতীতে লুসেই–পাংখোদের সাথে বোম পুরুষদের চুল বাঁধার ব্যাপারে পার্থক্য, লুসেই ও পাংখো উপজাতীয় পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুল রেখে মাথার পিছন দিকে চুলের ঝুঁটি বাঁধে। আর বোম পুরুষেরা মাথার ঠিক উপরে চুলের ঝুঁটি বাঁধে। গ্রামদেশে এখনও লুসেই, পাংখো ও বোম পুরুষদের মধ্যে লম্বা চুল ও চুলের ঝুঁটি বাঁধতে দেখা যায়।

বীরত্ব, সম্মান ও উপাধিঃ লুসেইরা বীরের পূজারী। পূর্বে, বীরত্ব, সততা ইত্যাদি গুণের জন্য লুসেই সমাজে কোন কোন ব্যক্তিকে thangohhuah (থাংগোহ্হুয়াহ্) উপাধি প্রদান করা হতো। এদেরকে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে সবার আগে মদের পাত্র দিয়ে সম্মানিত করা হতো এবং মৃত্যুর পরে তারা স্বর্গে যাবে বলে বিশ্বাস করা হতো। এ বিষয়ে Coil. J. Shakespear লেখেছেন. " if he performed a series of feasts, he used to have the title of Thangohhuah and was allowed to wear special strippled turban (diar) which signified that after death he would go to heaven. The Tlawmngai i. e. those who had received such a title from the elders of the society by a feat of bravery, honesty, courteousness etc. were honoured, and they used to have the first cup of rice beer (zu) as a token of gratitude and respect in all social gatherings.

লুসেই ও পাংখোদের গ্রাম ও বাসগৃহঃ অতীতে প্রায় কুকি–চিন ভাষী উপজাতীয় লোকেরাই নিরাপত্তার কারণে, উঁচু উঁচু পাহাড় পর্বতে তাদের গ্রামগুলি নির্মাণ করতো। তারা গ্রামের চারিদিকে শক্ত শক্ত গাছের খুঁটি পুঁতে বেষ্টনী তৈরী করতো। তারা পাহাড়ের উপর সুবিধাজনক স্থানগুলিতে বড় বড় পাথর স্তুপ করে জমা

করে রাখতো এবং শত্রদের দেখলে ঐগুলি গড়িয়ে দিত। এ ছাড়া রাত্রেও তারা গ্রামের পাহাড়ী পথগুলিতে বেতের তৈরী বিষাক্ত কাঁটা ছড়িয়ে দিত। রাতের অন্ধকারে শত্রুরা খালি পায়ে তাদের গ্রাম আক্রমণ করতে যাবার চেষ্টা করলে ঐগুলি তাদের পায়ে ফুটে তাদেরকে বাধা দিত। এ ছাড়া গ্রামের একস্থানে 'জলবুক' নামক বড় ধরণের মাচাংঘর থাকতো। সেখানে যুবকেরা একত্রে ঘুমাতো ও পাহাড়ার ব্যবস্থা করতো। প্রয়োজনে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য সেখানে তাদের অস্ত্রসস্ত্রও রাখা হতো।

বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন উপদেষ্টা মিঃ সুবিমল দেওযান চল্লিশের দশকের শেষ দিকে জুড়ছড়ি এলাকায় ঠেগার কাছাকাছি একটি গ্রামে যান। প্রায় দু হাজার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি পাহাড়ের উপর ঐ গ্রামটি ছিল। সেখানে একই গ্রামে একদিকে পাংখোরা এবং অন্যদিকে বোমারা বসবাস করছিল। তারা ঐ সময় গ্রামের প্রবেশ পথে গোলপেস্টের মত একটি পোষ্ট করে তাতে মুগুর ঝুলিয়ে রেখেছিল। এর অর্থ–হলো বহিরাগতদের জন্য গ্রামে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। সাধারণতঃ আশে পাশের গ্রামগুলিতে কলেরা বা অন্যান্য কোন দুরারোগ্য মহামারীর প্রদুর্ভাব দেখা দিলে তারা এইভাবে গ্রাম–বন্ধ করে থাকে। মিঃ দেওয়ানের প্রবেশের ফলে অনুষ্ঠান নতুন করে শুরু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তিনি তাদেরকে একটি শূকর ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোরগ মুরগীর দাম দিলে তারা হৃষ্ট চিত্তে আবার নতুন করে গ্রাম–বন্ধ অনুষ্ঠানটি করে।

এবার পাংখোদের বাসগৃহের বর্ণনা দেওয়া যাক। তাদের বাড়ী গুলি সাধারণতঃ এক কক্ষ বিশিষ্ট মাচাংঘর। বাড়ীর সামনের অংশে একটি বেড়াহীন কক্ষে নানাপ্রাণীর মাথা বেড়ায় ঝোলানো থাকে। এটি তাদের সমাজে বীরত্বের প্রতীক হিসাবে ধরা হয়। এরপরে থাকে তাদের মূল কক্ষ। এই কক্ষটি বেশ বড় মাপের। এই কক্ষেই বিভিন্ন অংশে পরিবারেরসকল সদস্যরা ঘুমায়। এখানে একস্থানে ঘুমানোর সময় বালিশের মত ব্যবহার করার জন্য একটি লম্বা গাছের গুঁড়ি রাখা হয়। মূল কক্ষের একপাশে রান্নার জন্য চুল্লি থাকে।

লুসেইদের সামাজিক কাঠামোঃ লুসেইরা তাদের প্রধানকে 'লাল' বলে। তাদের সামজিক কাঠামো সম্পর্কে Dr. B. B. Goswami তাঁর লিখিত The Mizo Unrest (1979, pp. 96-98) বইটিতে নিম্নলিখিত কাঠামোটি তুলে ধরেছেন–

Lal (Chief)
Upa ... ... Puithiam
(Councillors: for administration (Priest) and justice.)
Zalen .. .. Tlangau (Village Crier)
Ramhual Thirdeng (Black Smith)
(for agriculture)

Colonel J. Shakespear (1912) লুসেইদের লাল-এর ক্ষমতা ও কার্য সম্পর্কে লেখেছেন, "He (Lal) was the leader in war, as well as administrator of the village. The chief allowed his people to cultivate in his land .....for which he used to receive tax in kind .....All orphans and poor people used to take refuge in the chief's house. In the past if a person commiting a serious crime like murder could take refuge in the chief's house, he could escape the vengeance of others.".

বোম ও লুসেইদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত অনুষ্ঠানঃ উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৩৮ সালের দিকে) বোমদের নেতা Liankung আরাকানের বৃটিশ অফিসার A. P. Phayre কে তাদের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে যা বলেছেন সে সম্পর্কে Sir A. P. Phayre (1841) লেখেছেন, We (the Bawms) burry our dead, the corpse is placed in a shifting posture, with a pipe in its mouth, food by its side, and kung; besides these a moung (Burmese gong), asword, a spar, together with the feathers worn in the hair by men of rank."

অতীতে লুসেইরাও বোমদের মত মৃতের সাথে অস্ত্রসস্ত্র কবরে দিত। এ বিষয়ে Captain T. H. Lewin তাঁর লিখিত The hill tracts of Chittagong and the dwellers therein (1869) বইটিতে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হলো কোন পরিবার প্রধানের মৃত্যু হলে তাকে ভাল ভাল পোশাক পরিচ্ছদ পরিয়ে ঘরের মাঝখানে বসা অবস্থায় রাখা হয়। তাঁর ডান হাতে অস্ত্রসস্ত্র ও বন্দুক তুলে দেওয়া হয়।

সমবেত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য ভোজের আয়োজন করা হয়। ভোজের সময় মৃতের সম্মুখে তাঁর জন্য ভাততরকারি সাজিয়ে রাখা হয়। তখন উপস্থিত লোকেরা তাঁকে সম্মান জানিয়ে বলে, "আপনাকে বহু দূরে যেতে হবে। আপনি দয়া করে এই খাবারগুলি খান।" এরপর তারা তাঁর পাইপটিতে তামাক পুরে তাতে অগ্নি সংযোগ করে তাঁর মুখে গুজে দেয়। এ সব অনুষ্ঠানের পর তারা যথারীতি মৃতকে কবর দেয়।

ভাষাঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, লুসেই, পাংখো এবং বোমদের ভাষাগুরি কুকি-চিন (Kuki Chin) দলের অন্তর্ভুক্ত। তবে এদের মধ্যে লুসেই ও পাংখোদের ভাষা দু'টির মধ্যে নৈকট্য বেশী। উল্লেখ্য যে, পাংখোরা লুসেইদের ভাষা বুঝতে পারে। লুসেইদের নিজস্ব বর্ণমালা নেই। তারা ইংরেজী বর্ণগুলি দিয়ে তাদের ভাষা লিখে ও পড়ে থাকে।

বাঁশ নৃত্য ও উৎসবঃ লুসেই, পাংখো ও বোমদের মধ্যে বহু নৃত্য আছে। এগুলির মধ্যে বাঁশনৃত্য দেখতে খুবই চমৎকার। এতে বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে তরুণীরা যখন পা ফেলে ফেলে নাচে তখন দেখতে খুব সুন্দর মনে হয়। বর্তমানে লুসেইদের বাঁশনৃত্য (Bamboo dance) দিন দিন দশকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে চলেছে। লুসেইদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের নাম খোয়াংচাই। অতীতে প্রতি বছর তারা যেদিন খানাপিনা, নৃত্যগান ও ফূর্তিতে এই উৎসব মহা সমারোহে উৎযাপন করতো তখন তাদের গ্রামগুলি চাকমাদের বিঝু উৎসবের মত আনন্দে মুখরিত ও উদ্বেলিত হয়ে উঠতো।

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরী

ক্রমিক নং- ... ... স্বাক্ষর-... ...

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাষাগুলির শব্দ সংগ্রহ

ক. সংখ্যাবাচক শব্দঃ—

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	খুমি
১.	এক	এক	ঙই	সা	লক	আ	পাখাত	পাখাত	পাখাত	হ্রত	
২.	দুই	দুই	নই	নুই	প্রেঁ	নিঙ	পায়নি	পানিহ্	পানি	নী	
৩.	তিন	তিন	সুং	থাম	চুম	সুঙ	পায়তুম	পাথুম	পেথুম	থুম	
৪.	চার	চেইর	লে	ক্রই	তালি	প্রীহ্	পায়লি	পালি	পালি	প্রী	
৫.	পাঁচ	পাচ্	ঙা	বা	তাঙা	ঙা	পাঙা	পাঙা	পাঙা	পাইঙ	
৬.	ছয়	ছ	খ্রু	দক	তারুক	ক্রুখ্	পারুক	পারুক	পারুক	শোক	
৭.	সাত	সাত	খুই	নি	রিনিত	খ্নিং	পায়সারি	পাস্রিহ্	পাসেরি	সে	
৮.	আট	আস্ত	সই	চার্	রিয়াত	আচাইখ	পায়রিয়াত	পারিয়াত	পারিযাত	সেত্	
৯.	নয়	ন	কো	চিকক্	তাকু	তাহ্	পায়কোয়া	পাকুয়া	পাকুয়া	কো	
১০.	দশ	দচ্	চে	চি	হামুত	সীহ্	সম্	পারা	সম্	হা	
১১.	এগার	এগার			লাইলাক	সীহ্ সু-আ	সম্-পাখাত	লেইখাত	খাত সম্-পানি	পাইলেআক	
১২.	বার	বার			লাইপ্রে	সাহ্-নিহ্	সম্ পানী	লেইনিহ্	সম্ পানি	পাইলেনী	
১৩.	তের	তের		চিথাম	লাইচুম	সাহ্-সুঙ	সম্-পাতুম	লেই থুম	সম্ পাথুম	পাইলেথুম	

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	খুমি
১৪	বিশ	কুরি			পির্মি	হুং	সম্-নি	কুল	সমনি	কুল	
১৫.	একুশ	এগোচ্			পির্মি-লাইলক	হুং-সু-আ	সমনিপাখাত	কুলপাখাত	সমনিপাখাত	কুলকাদিহাত	
১৬.	বাইশ	বেইচ্						কুল-পানিহ্	সম্-নি-পানি		
১৭.	ত্রিশ	তিরিচ্			চুংকর			সম্-থুম	সমহ্ম	থুংগীপ	
১৮.	একত্রিশ	এগোত্রিচ			চুংকর-লাইলক			সম-থুম-পাখাত	সমথুমপাখাত	থুংগীংগোলাহাত	
১৯.	চল্লিশ	চোল্লিশ		ক্রই-চি	লি-কম্			সম্-লি	সম্-লি	ত্রী-গীপ	
২০.	পঞ্চাশ	পন্জাচ		বা-চি	ঙা-কম্			সম্-রুক		ঙ-গীপ	
২১.	ষাট	ষেইট্		দক্-চি	তারুক্-কম্			সম্-রুক		শোকগীপ	
২২.	সত্তর	সোত্তোর		সিনি-চি	রিনিত্-কম্			সমত্রিহ্		সে গীপ	
২৩.	আশি	আঝি		চার-চি	রিয়াত্-কম্			সম্-রিয়াত্		সেত্-গীপ	
২৪.	নব্বই	নব্বোই	কো-হ্নে	চিকুক্চি	তাকু-কম্			সম্-কুয়া		কো-গীপ	
২৫.	একশত	এক-শ	ত-রা	রা-সা	আ-কম্	তারাহ্		জা-খাত		ত্রাযার্ক	
২৬.	একশত এক	এক-শ-এক									
২৭.	একশতদুই	এক-শ-দুই									
২৮.	একহাজার	একহাঝার	ত-থং	সাই		ঠং-না		সং-খাত		থোঙাক	

খ. প্রকৃতি বিষয়ক শব্দঃ

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	ত্রুম
২৯.	সূর্য	বেল্	নিং	সাল্	চাত্	চামিক্	নিসা	নি		খনী	
৩০.	চন্দ্র	চান্	লা	তাল্	লামা	সাদাহ্	খ্যা	গ্রাপা		খ্র	
৩১.	আকাশ	আষাচ	গংখাং	নখা	মুক-কুয়াং	কংগ্রাক	ভান	ভান্		হন্	
৩২.	তারকা	তারা	ক্রে	হাঁদুগিরি	কারেক	নাকখেক্	আরসি	আরফি		আসেখোল	
৩৩.	আলো	পহ্র	আলাং		আনই	আলাংবং	নং	চেও		ওয়া	
৩৪.	অন্ধকার	আনধার	আমোয়ে		আ-ইট	আমাইক্মহ্		মুই		ইয়ুহ্	
৩৫.	দিন	দিন			নি		নি	নি	নি	ফুল	
৩৬.	রাত্রি	রেইত					হানা	জান	জিংলাই	ইয়ন	
৩৭.	পাহাড়	মুরা	তং	হাপং/হাচো	লুং	টাঘো	টাং			খুয়ুহ্	
৩৮.	নদী	গাঙ/ছরা	খাং	তইমা	অ	পেপী		তিভা		হলং	
৩৯.	পৃথিবী	পিথিমী	কবা	হা	লুচা	কাম্বা	খবেল	লাইকোল-ই		লুদুল	
৪০.	গাছ	গাচ	সপাং	বফাং	চিং	ফুংফাহ্	খিং	খিং		খিং	
৪১.	বাঁশ	বাচ	ওয়া	ওয়া	কাউ	ক্র	মাউ	মাও		য়ো	
৪২.	অরনা	ঝার্	তোয়া			মালিঙ	রামনুয়াই	তোমাং		তেউলুঙচিঙ	
৪৩.	ফুল	ফুল	প্যাই	খুম	পাউ	আপাইং	পাংপার্	আপার্		খেইপা	

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	ত্রুমি
৪৪.	পাতা	পাদা	আরোয়ক	লাই	আরাম	আতাক	নাহ্	আনাহ্		সেই	
৪৫.	ফল	গুলা	আসি	বাথাই	আওইহ্	আসীহ্		আরাহ্		থেয়	
৪৬.	ঝুম	জুম	য়া	হোগ্	ওয়া	ইপ্থা	লও	লাও		লোউ	
৪৭.	মাটি	মাদি	ক্ষ্য	হ্য	বন্		লেই	তোয়াল		দেক্	কাজাগ্
৪৮.	পাথর	পাথর	কাক্	হলং	হ্যা	তালুং	লুং	লুং		লুহ্	
৪৯.	জল	পানি	রি	তুই	তুই	ইহ্	তুই	তি		তুই	
৫০.	বৃষ্টি	ঝর	মো	ওয়াতুই	ওয়াং	হ্রাং	রোয়া(?)	রোয়াই		খো	
৫১.	আগুন	আগুন	মিং	হ্র	মাইহ্	ভাইং	মেই	মেই		মেই	
৫২.	বাতাস	বুইয়ার	লি	নবার	লি	থিল	থিল	থিল		ত্রী	

গ. মানুষ ও দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ক শব্দ

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	ত্রুমি
৫৩.	মানুষ	মানুচ	লু	বরক্	মারুসা/ম্রো	তাসাভ্রাইং	মি	মিনুং	মি	ক্	
৫৪.	পুরুষ	মরত	য়াক্সা	চারক	কাজাকওয়া	তাসালং	মিপা	মিপা	মিপা	মুতো	
৫৪.	পুরুষ	মরত	য়াক্সা	চারক	কাজাকওয়া	তাসালং	মিপা	মিপা	মিপা	মুতো	
৫৫.	স্ত্রীলোক	মিলা	মিমা	বিরক	মাচিওয়া		মেইছিয়া	নুনাও	নুনা	পুতো	

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	ত্রুমি
৫৬.	শরীর	কেইয়া	খেংথা	বাসাক	কহ্	কেংঠা	তাকশা	তাক্	সুংড্রিল	পুম	
৫৭.	চোখ	চাক	ম্যাচি		মিক	আমির্ক	মিত	মিত	মিক	মিক	আমিক
৫৮.	নাক	নাক	নখঃ	কুং	নাখং	আসকানোহ্	নার	নারকং	নাঃর	হুকতো	
৫৯.	মুখ	মু	প্যাজাহ্	বুকুক	নর্	আমাই	মুই	কা	মুর	অমা	
৬০.	চুল	চুল	ছাইবাং	খানাই	চাম	আহ্মিঙ	সাম	সাম	সাম	লুসম	
৬১.	মাথা	মাথা	আগ	বখরক্	লু	অহ্	লু	লু	লু	লুকি	
৬২.	হাত	আহ্ত	আলাক্	য়াক	কুত্	তাহ্	কুত্	কুত্	পুয়াম	কুত্	
৬৩.	পা	খেং	আখ্রি	য়াঙ্গুই	খক্	আতা	কে	কে	পাইমারাই	খো	
৬৪.	বুক	বুক	রাংফে	বাখা	ইয়ন	রাং	অম	ইর	চাং	কাঙচাঙ	
৬৫.	পিঠ	পিত্	নকুং	ফিকুং	কুম	আকাসাঙ	নুং	কেং	নুং	নুঙ	
৬৬.	গলা	গওনা	লইফাং	কতক	খর	আকাদুক্		ঙং	রিং	লোকো	
৬৭.	নখ	নক্	লাসে	য়াইসুক	কুত্মি	তাকমিঙ	তিন্	তিন্		তীন্	
৬৮.	ফুসফুস	অঞ্জ	আছু	বসবং	আচুক	আসুক	চুয়াপ	চোয়াপ	নুননাহ্	ওচোপ	
৬৯.	কলিজা	কোলজা	আছে	বাখাতাই	আপ্লং	আঙসীঙ	খিন	খিন	মিখিন	খীন	
৭০.	হৃদপিন্ড	পরানঘর	আসাইং	বাখা	আচাক্	আনালুহ্	লুং	লুং	মালুম	লুঙপুম	
৭১.	নাভি	নিয়েই	খ্যা	অমাথাই	দাইহ্	আন্থু	লাই	লাই	মালাই	ক্রয়	

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	খুমি
৭২.	উরু	ধাবানা	পংসা	য়াকং	ঙু	আতাকাবক	মাদুই	এল	এল	কেই	
৭৩.	মগজ	মগচ	ওলছি	বুমুতাম	লুরুকজাক	উনক	দুয়াক	খোলয়াক	বেহয়াক	লুংত্রোক	
৭৪.	রক্ত	লো	সুই	থুই	ওয়িহ	সে	বি	বি	বিঃ	হৈ	

ঘ পশু পাখি ও অন্যান্য প্রাণী বিষয়ক শব্দঃ

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	খুমি
৭৫.	গরু	গরু	নোয়া	মুসুক	জিয়া	স্মুক	বং	চপ		সেল	.
৭৬.	মহিষ	মোচ	কোয়ে	মুসুই	মুসুই		ত্রীঅহ	লই	না		ন
৭৭.	ছাগল	ছাগল	ছুই	পুরান	রুয়াহ	কাপিশ	কেল	কেল		মাঃ	
৭৮.	বাঘ	বাঘ	ক্যা	মাছা	প্রি	কাসা	ছাকেই	চাকেই		কেই	তকা
৭৯.	ভল্লুক	ভালুক	ওয়েং		তম		ছাতম	তম		হোম	
৮০.	হাতী	এত	ছাং	মায়োং	ঙাচাই	উকুহ	ছাই	সাই		মুই	
৮১.	বানর	বান্দর	মা	মাখারা	ইয়ুক	কাবই	জংতে	জং		ইয়োং	
৮২.	হরিণ	ওরিং	খি	মুসুই	নাকি	ইসি	সাজুক	সাখি		সাক	
৮৩.	বিড়াল	বিলেই	ক্রং	আমিং	মিন	হাইং	জতে	সিজহ		মিন	
৮৪.	শিয়াল	শিয়াল	খোঃওয়া			শোওয়া	শিংহাল	কলউই		খেওয়া	
৮৫.	কুকুর	কুকর	খুই	সুই	কুইহ	কুহ	উই	উই	উই	উই	উই

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	খুমি
৮৬.	সাপ	সাপ	ম্রিং	চিরুক	ঙারে	কাহ্	রল	রল		ফোল	পুমি
৮৭.	ইঁদুর	উন্দুর	ক্রোয়ক	সিজর	ইত্মা	কায়ুই	সাজ	হুংনাম		হিয়ু	
৮৮.	কাছিম	দুর	লুই		লিপ		সাতেল	সেরেরহুতেল			
৮৯.	পাখি	পেইক	ঙাক	তক	ওয়াক্লিং	উসি	সাবাহ্	ভা		হ্য	
৯০.	মুরগী	কুক্কুরি	ক্রমা	তক্মা	ওয়ামা	উসু	আরনু	আরপ্পু		আনু	
৯১.	হাঁস	আচ্ছ	বে	তাখুম	ওমপাই	বাইহুবে	বারাকপা	ভারাক		ওয়ম	
৯২.	চিল	চিল	ম্লিং	তকলিং	ওয়ামু	সিঙ	মুলুকল	মুরা		মু	
৯৩.	বুলবুলি	জুরপেইক	দচ্র	লৈবলঃ	বেরপ	তকত্রেঙ	ক্লাইভের	ভাবেরহ্		বেঙবেলে	
৯৪.	চড়ুই	চোরোই	ইংবোয়েচা			চাসা	চংজং	পিত্রুত		ইমচোঙহ্	
৯৫.	টিয়া	তদেক	ক্সি	বাহু	ওয়াকেক	রেক	বাকিহ্	ভাইতেকা		ঝী	
৯৬.	বক	বগা	ব্যাংং	বকা	হুইপাই		হুইহবাহ্	লিলিআর		বেন	
৯৭.	ঘুঘু	কহু	গ্রো	তাকখু			মুরউ	ভাহু		খোঙখো	ভাহুক
৯৮.	পেঁচা	পেজা	খপ্র		বুংকুহ্	হুংবুক	হিমবুক	সোমবোহ্		হুক	

৬. খাদ্য , শস্য ও ফল বিষয়ক শব্দঃ

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	খুমি
৯৯.	ভাত	ভাত	খামাং	মাই	হম	পুক	চ	কুহ		বু	
১০০.	মাছ	মচ	ঙাঃ	আ	দাম		সাংয়া	ঙা		অঙ	তানা
১০১.	ডিম	বদা	উ		ওয়াদুই	উক্সি			আরবুই		কুনুই
১০২.	মাংস	এহুরা	হ্যাংসা	মুইখান	ঙা	কেওহেঙ	সা			শঅ	
১০৩.	চিংড়ি	ইঝা		আঙুক	চংহ	আসহুক	কাইক্রয়াং	ঙাইকোয়াং		কিকোঙ	
১০৪.	বেগুন	বেগুন	খেরেংসি	ফনক	মিনতাউহ	পাঅংসীহ		বন		ঙথেই	
১০৫.	লাউ	কুদুগুলা	কুসি	মিলক	চাংক	সাংকোসীহ	উময়েই	উমযাই		উমথেই	
১০৬.	কুমড়া	ওগুরিগুলা	ক্রুংসি	কানপেন		আন্দাসীহ		মাইসেন		ময়থেই	
১০৭.	সীম	সুমি	পেসি		বে	পেলংসীহ	বেপুই	বাইলস		কেথেই	
১০৮.	কচু	কোজু	প্রিং		কহ	প্রীহ	বাল	বা		বল	
১০৯.	ধান	ধান	চবা	মাই	জা	আং	বু	ফাং		চহ	
১১০.	তিল	গোচ্যা	নেই	সিপিং		স্বাং	হুহি	সিরিয়া		সী	
১১১.	সরিষা	সোজ		হইরো		মুঞাং	তেলঠা	হয়র		মোনইয়াং	
১১২.	তুলা	তুলা	গোয়েং	মুলাই	লাহ	তাজ	লাপুয়া	লা		ফয়	
১১৩.	হলুদ	ওগুলোদ	নোনোহ	সুনই	চুয়ামা	কাএ	আইএং			অয়	

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	ত্রুমি
১১৪.	আদা	আদা	খ্যাং	হাইচিং	তাম	কেহ্	ছুতিং	আইখিং		খিন	
১১৫.	আম	আম	সারাসি		ওইক্রুম্		ইহ্রয়	খেইহাই		হ্রয়খেয়	
১১৬.	কাঁঠাল	কাত্তোল	পেনেসি	খাইপং	লাহ্মা	পানেহ্সীহ্	লাউই	নুনুন্		পেনেইখেই	
১১৭.	কলা	কলা	নাপ্যাসি	খাচুই	দেংওইহ্	চাউসীহ্	বাল্লাহ্	বান্লা		নামপো	
১১৮.	পেঁপে	কৌপিয়া	পদাপাসি	কক্কিয়া	বেত্তাকা	পাদাগ্রাসীহ্		কামুক		সামতোপেনেই	

চ. আত্মীয় বিষয়ক শব্দঃ

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	ত্রুমি
১১৯.	বাবা	বাপ্	আফা	পা	পা	আভাহ্	আপা	পা	পা		
১২০.	মা	মা	অমিং	মা/প	ও	আনহ্	কানু		নু	উনু	
১২১.	ভাই	ভেই	আকো/নিসে	তাকুক	তানাউ	ফুংনাহ্	কানাও	উনাওপা	সোপুই	বে	
১২২.	বোন	ভোন	আমে/	নানক	তুয়ামা	আচাইঙ	নাওতে	ফারনু	সারনু	বেমুতো	
১২৩.	পুত্র	পুয়া	সা	ছাচালা	জাহ্	আসা	মিপা	ফাপা	কাইমানাও	চ	
১২৪.	কন্যা	ঝি	সিমিং	ছাবুরোই	জামাহ্	আসাইক	মেছিয়া	ফানু	কাইমাসনু	চুনু	
১২৫.	স্বামী	নেক্	লাং	চালা	হ্রা		পাসাল	পাসাল	মাসাল	অপতো	
১২৬.	স্ত্রী	মোক	ম্যা	বুরোই	মাচিহ্		নুপুই	নুপি	দং	ফিয়া	
১২৭.	মামা	মামু	আখাং	মামো	তারাং	আতেহ্	কাপু	পু	পুত	পুপু	

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	ত্রুমি
১২৮.	মামী	মামী	আরি	আনই	নাকহ্	আহ্হ্	কাপি	পি	পিতে	পুম	
১২৯.	জামাই	জামেই	সামাক	চামিরি	মকজাহ্		ফানুঅপাসাল	সামাক	তুনুমাসাল	সামাক	
১৩০.	বউ	বো	খেয়ো	হামজক	ইউজাহ্		মোনু	মাওনু	দং		

ছ. সর্বনাম ক্রিয়া বিষয়ক শব্দঃ

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	ম্রো	চাক	লুসেই	বোম	পাংখো	খ্যাং	ত্রুমি
১৩১.	আমি	মুই	ঙা	আং	আং	ঙা	কেইমা	কেইমাহ্		কেই	কাই
১৩২.	তুমি	তুই	মাং/নাং	নুং	এন্	নাং	নাংমা	নাংমাহ্		নাং	
১৩৩.	সে	তে	ইয়াসু	ব	নামি	আমা	আনিহ্				
১৩৪.	আমরা	আমিহ্	ঙোরো	চুং	আংইং	নিয়াক	কানভাইন				
১৩৫.	তোমরা	তুমিহ্	মাংরো/নাংরো	নক	এন্নি		ইনভাইন				
১৩৬.	তাহারা	তারাহ্	ইয়াসুরো	বক	কাবুয়াহ্	আমালিঙ	আনিহ্				
১৩৭.	খাওয়া	খানা	আচা	চাখাই	জাহ্	সাহে	এই	আই		এই	
১৩৮.	যাওয়া	যানা	আলা	খাংখাই	মা	লাংহে	কাল্	কাল্		চেতস	
১৩৯.	লওয়া	লনা	আয়ু	লাখাই	প	লাহে	লার্	লাক্		কিচিএই	
১৪০.	করা	পরানা	আলু	খাই	জাং		তিতুর	তিহ্		পেসো	

গ্রন্থ পঞ্জী

বাংলা বইঃ

ঘোষ, সতীশ চন্দ্র ১৯০৯ ইংঃ চাকমাজাতি, কলিকাতা।
চাকমা, নোয়ারাম ১৯৬২ ইং ঃ পার্বত্য রাজলহরী রাঙ্গামাটি।
চাকমা, মাধব চন্দ্র ১৯৪০ ইংঃ রাজনামা।
চৌধুরী, পূর্নচন্দ্র ১৯২০ঃ চট্টগ্রামের ইতিহাস
ত্রিপুরা, সুরেন্দ্র লালঃ ত্রিপুরা পূজাপার্বণ
দেওয়ান, কামিনী মোহন ১৯৭০ ইংঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দীনসেবকের জীবন কাহিনী, রাঙ্গামাটি।
দেওয়ান, বিরাজ মোহন ১৯৬৯ঃ চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, রাঙ্গামাটি।
মজুমদার, রমেশ চন্দ্র ১৯৮১ ইংঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, ৭ম সং, কলিকাতা।

বর্মী বইঃ

জনৈক রাখাইন ছেরাদ ১৮৮২ ইংঃ ধান্যাওয়াদী আরেঃ দ ফুং
চান্দামালা লংকারা ১৯৩১ ইংঃ ধান্যাওয়াদী রাজাওয়াং সাইক্যম, মান্দালয়।

ENGLISH BOOK:

Basu, N. K. 1970: Assam in the Ahom age, Calcutta
Bessaignet, Pierre 1958: Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts,
Bessaignet, Pierre 1959: Social Research in East Pakistan, Dhaka
Campos, J. J. A. 1919 : History of Portuguese in Bengal, Calcutta
Chatterji, S. K. : The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta.
Chatterji, S. K. 1974: Kirata Jana Krti (2nd ed.)
Calcutta
Cotton, H. J. S. 1880: Memorandum on the revenue history of Chittagong, Calcutta
Dalton, E. T. 1872: Tribal History of Eastern India, Calcutta.
Gait, E. T. 1906: History of Assam, Calcutta
Goswami, Dr. B. B. 1979: The Mizo Unrest, Jaipur
Grierson, Dr. G. A. 1903: Linguistic Survey of India, Calcutta.
Hunter, W. W. 1896: Statistical account of Bengal (Chittagong and Tripura part), Calcutta.
Hutchinson, R. H. S. 1906: An account of Chittagong hill tracts, Calcutta.
Hutchinson, R. H. S. 1909: Chittagagong hill tracts (gazetteer)
Lewin, T. H. 1869: The hill tracts of Chittagong and the dwellers there in, Calcutta.
Lewin, T. H. 1912: A Fly on the wheel, London.
Mackenzie. A. 1884: The North East Frontier of India.
Phayre, Sir Arthur P. 1883: History of Burma, London.
Rajput, A. B. 1963: The Tribes of Chittagong Hill Tracts, Karachi.
Roy, Raja Bhuvan Mohan 1919: History of Chakma Raj Family.
Saigal, Omesh 1978: Tripura, Delhi.
Smith, Vincen 1961: History of India (3rded)

লেখক পরিচিতি

সুগত চাকমা (ননাধন)ঃ

জন্মঃ ২৪শে মার্চ ১৯৫১ ইং, রাঙ্গামাটি। শৈশবের সোনালী দিনগুলি কেটেছে রাঙ্গামাটির পাহাড়ে পাহাড়ে। কৈশোরের দুরন্ত দিনগুলি কেটেছে ছোট্টনদী খাগড়াছড়ির তীরে। ভ্রমণ করেছেন অসংখ্য আরণ্য জনপদ। আর তাই স্বাভাবিক ভাবেই লেখকের লেখনীর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে উপজাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি ভালবাসা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

পড়ালেখায় হাতে খড়ি রাঙ্গামটির মিশন স্কুলে, তারপর রাঙ্গামাটি সরকারী হাইস্কুল ছেড়ে খাগড়াছড়ি সরকারী হাইস্কুলে, এরপর আবার রাঙ্গামটি সরকারী কলেজে, সেখান থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানেই পদার্থ বিদ্যায় এম. এস. সি পাশ করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউটে এম. ফিল. কোর্সেও অধ্যয়নরত রয়েছেন।

ইতিমধ্যে তাঁর লিখিত বহু কবিতা, গান গল্প, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– চাঙমা বাঙলা কথাতারা (চাকমা বাংলা অভিধান ১৯৭৩ ইং), চাকমা কবিতার বই 'রঙধঙ' (১৯৭৮ ইং), চাকমা পরিচিতি (১৯৮৩ ইং), বাংলাদেশের উপজাতি (ঢাকা ১৯৮৫ই, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত), পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাষা (রাঙ্গামাটি ১৯৭৮ ইং, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত), সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিতব্য চলতি বইয়ের তালিকায় প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে তাঁর লিখিত বই– 'চাকমা রূপকথা' ইত্যাদি।

কর্মজীবনে মিঃ চাকমা উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের একজন সহকারী পরিচালক।